বিলুপ্ত লজ্জা

– তৃণা

গত বছর এ সময়ই মামার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার পর গোসল সেরে বারান্দায় কাপড় নাড়ছিলাম। হঠাৎ বেডরুমের জানালাতে চোখ পড়তেই দেখলাম আমার মামাতো বোন ঐমি। বয়স পাচ বছর। তার শাড়ি পরে, কোলে পুতুল নিয়ে আয়নার সামনে নানান রকম ভঙ্গিতে নিজেকে দেখছে। একেকটা বয়সে মেয়েরা শাড়ি পরে একেক কারণে। তেমনি তার বয়সের গুণে সে নিতান্তই খেলা করার জন্য শাড়ি পরেছে। আমরা কিশোরী বা তরুণীরাও শাড়ি পরি। তবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। গৃহিণীরা শাড়ি পরেন বাঙালির ঐতিহ্য বলে। যদিও আজকালকার গৃহিণীদের শাড়ি পরতে খুব একটা দেখা যায় না। এভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঐমির চোখ আমার দিকে পড়লো। মনে করেছিলাম সে ভীষণ লজ্জা পাবে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বললো, তৃণাআপু, দেখো তো, আমাকে কেমন লাগছে? আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সে আরো বললো যে, সে নাকি তার কোলের বাচ্চাটার জন্য শাড়িই পরতে পারে না।

অথচ প্রায় একই ঘটনা আমার ছেলেবেলাতেও ঘটেছিল। কি লজ্জাই না সেদিন পেয়েছিলাম। ছুটির দিন ছিল। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। আর আমি শাড়ি পরে আচল দুলিয়ে আয়নার সামনে গান গাইছিলাম যেন টিভিতে অডিশন দিচ্ছি। হঠাৎ আয়নার মধ্যে দ্বিতীয় মানবের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম এবং তিনি আর কেউ নন, আমার গৃহশিক্ষক। বলা বাহুল্য, বিশেষ অসুবিধার কারণে বৃহস্পতিবার বিকেলে পড়াতে আসতে পারেননি। তাই ছুটির দিনে পড়াতে এসেছেন এবং এতোক্ষণ সময় ধরে তিনি আমার পড়ার ঘরের দরজার সামনে দাড়িয়েছিলেন আমার কাণ্ডকারখানা উপভোগ করার জন্য। আমি না পারছিলাম দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে, না পারছিলাম দাড়িয়ে থাকতে। অবশেষে আমার পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি বলেই বসলেন, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, এ রকম ঘটনা সবারই ঘটে।

আসলেই তো, এ রকম ঘটনা প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। সেদিন যেমন আমার মামাতো বোনের বেলায়ও ঘটেছে তেমনি তারপরেও কারো বেলায় এ রকম লজ্জাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কিন্তু মাঝ থেকে লজ্জা জিনিসটাই হয়তো বা হারিয়ে যাবে। সেদিন লজ্জা হয়ে যাবে বিলুপ্ত।

শিমুলতী, গাজীপুর থেকে

ধন্যবাদ

– আলাউদ্দিন

৭ এপ্রিল ২০০২–এর সন্ধ্যায় আমাদের দোকানের সামনে নতুন একটা ওপেল গাড়ি এসে থামলো। পিংক কালার শাড়ি পরা সুন্দরী একটা মেয়ে আমাদের পাশে মানি এক্সচেঞ্জে প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখলাম, তার শাড়ি বের হয়ে চাকার সঙ্গে লেগে আছে। জায়গাটা একটা বড় গাড়ি পার্কিং প্লেস ছিল। দৌড়ে তার গাড়ির সামনে দাড়ালাম। সে গ্লাস খুলে আমাকে বললো, হোয়াট হ্যাপেনড?

তখন ব্যাপারটা তাকে বললাম। সে খুব লজ্জিত হলো।

বললো, ইউ আর ফ্রম?

বাংলাদেশ বলায় অনেক ধন্যবাদ দিল আমাকে।

নেম?

নাম বললাম। তখন আমাকে একটা কার্ড দিয়ে তার চেম্বারে আসার জন্য সে বললো। সে শারজাহ কাশমি হসপিটালের মেয়েলি রোগের ডাক্তার, নাম হেলেন ডিসুজা, ইনডিয়ান, তামিলনাড়ুর। এখনো তার চেম্বারে যাইনি। শুধু ভাবতে ভালো লাগে তার শেষ কথা, ধন্যবাদ, বাংলাদেশ।

আজমান, ইউএই থেকে

যেদিন কেনা হয়নি

– আঞ্জুমানআরা আহমেদ

একজন বৃদ্ধ মহিলাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি তার জীবনে কতো শাড়ি কিনেছেন, উপহার দিয়েছেন বা পেয়েছেন তাহলে সত্যি তাকে বিপদে ফেলা হবে। আজ পর্যন্ত কতো রকমের, কতো ধরনের, কতো ডিজাইনের শাড়ি কিনেছি তার হিসাব মেলানো কঠিন। উপহার দেয়া এবং পাওয়ার বেলায়ও তাই। এখনো কোনো মহিলার পরনে সুন্দর একটা শাড়ি দেখলে জিজ্ঞাসা করি, কোন দোকান থেকে কেনা, কতো দামের? আসলে এটা মহিলাদের স্বভাব।

শাড়ি কিনেছি ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে, দোকান থেকে, মহিলাদের কাছ থেকে। এমনকি ফুটপাথ থেকেও। কিনেছি নিজের জন্য, মুরুব্বিদের জন্য, বোনদের জন্য, উপহার দেয়ার জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য, ভাইবোনদের বিয়ের শাড়ি, ছেলেমেয়েদের বিয়ের শাড়ি। বিশেষ কারোর জন্য নয়, কেবল আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব শাড়ি কিনতে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে গিয়েছি শাড়ির রঙ, ডিজাইন পছন্দ করতে।

কতো শাড়ি যে উপহার পেয়েছি। ঈদে, জন্মদিনে, বিয়েবার্ষিকীতে, বিদেশে টুর করে ফিরে আসা স্বামীর কাছ থেকে, ভাইবোনদের বিয়েতে, ছেলেমেয়েদের চাকরির প্রথম বেতনের টাকার শাড়ি, ছেলেমেয়েদের বিয়েতে শাশুড়ির শাড়ি, ভাতিজা–ভাতিজির বিয়েতে মুরুব্বির শাড়ি আরো কয়েক বছর বেচে থাকলে হয়তো নাতি–নাতনিদের বিয়েতে নানি ও দাদিশাশুড়ির শাড়ি পাবো। বিয়ের কনেকে গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে শাড়িতে সেই শাড়ি পরে দেয়া হয় বিয়েযোগ্য আত্মীয় কন্যাদের সে রকম শাড়িও উপহার পেয়েছি অবিবাহিত অবস্থায়।

শাড়ির কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সারা জীবন কেবল শাড়ি কিনতে, উপহার দিতে আর উপহার পেতেই কেটে গেল।

আজ লিখতে বসেছি প্রথম যে শাড়িটি আমার জন্য কেনা হয়নি সে কথা। আমরা পাচ ভাই, চার বোন। কিন্তু যখনকার কথা লিখছি তখন আমরা তিন ভাইবোন। আমি তখন খুব ছোট আর ভাই দুটো আরো ছোট। এ কাহিনী আমার মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু বড় হয়ে এ কাহিনী এতো শুনেছি যে, এখনো আমার কাছে গতকালের ঘটনা বলে মনে হয়। আব্বা ডাক্তার। তখন কর্মরত ছিলেন একটা ছোট মহকুমা শহরে। তখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়নি।

সে সময়ে আব্বা কাপড়–চোপড় কিনতেন পূজার সময়। কারণ তখন বিভিন্ন ডিজাইনের, বিভিন্ন ধরনের শাড়ি দোকানে আসতো। পূজার সময় আমার দাদিআম্মা, ফুপুআম্মারা আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। আব্বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে শাড়ি কিনতে গেলেন। ছোট মফস্বল শহর, সবাই সবাইকে চেনে। তার উপর আব্বা ডাক্তার বলে তাকে সবাই চিনতো। আব্বাকে দেখেই দোকানি বললেন, ডাক্তার সাহেব, আপনি কেন এসেছেন, খবর পাঠালে বাসায় শাড়ি পাঠাতাম। মা, দিদি, বৌদি পছন্দ করে কিনতেন।

আব্বা বললেন, তার দরকার হবে না, মেয়েকে নিয়ে এসেছি, সেই পছন্দ করবে। সত্যিই আব্বার সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করলাম দাদিআম্মার জন্য, আম্মা–ফুপুআম্মাদের জন্য। আব্বা নিজের জন্য ধুতি কিনলেন। তখন মুসলমানরাও ধুতি পরতেন। দোকানি শাড়ি কাপড় বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে আব্বাকে বললেন, খুকুমণির জন্য শাড়ি নিয়ে যান, সুন্দর সুন্দর শাড়ি এসেছে।

আব্বা বললেন, না, না সে শাড়ি পরে না। তার জন্য ফ্রক কিনবো।

আসলে আব্বা কখনো চাইতেন না তার মেয়েরা শাড়ি পরুক। আমরা বোনেরা বিয়ের আগ পর্যন্ত সালোয়ার কামিজ পরতাম। কিন্তু সে তো পরের কথা, সেদিনের ঘটনা ছিল অন্য রকম। যখন আব্বার সঙ্গে শাড়ি পছন্দ করছিলাম তখন আমার জন্য শাড়ি কেনা হবে তা ভাবিনি। দোকানির কথায় আমার খুশি লাগছিল। ভেবেছিলাম আব্বা বোধহয় আমার জন্য শাড়ি কিনবেন। তবে আব্বা শাড়ি না কেনায় মনটা ভার হয়ে গেল। বাসায় ফিরতেই দাদিআম্মা আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওর জন্য শাড়ি আনিসনি?

আব্বা জবাব দেয়ার আগেই এতোক্ষণের চেপে রাখা দুঃখ চোখের পানিতে বেরিয়ে এলো। কাদতে কাদতে বললাম, বাসায় একটাই মাত্র ছোটমেয়ে। তার জন্য শাড়ি না কিনে পারলো কি করে?

আব্বা আমাকে কোলে নিয়ে বললেন, কাদে না মা, আজ রাত হয়ে গেছে, কাল তোর জন্য ফ্রক কিনবো।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

হলের জীবন

– সালমা আক্তার

শাড়ি!

বঙ্গললনাদের প্রিয় পোশাক, প্রিয় সংগ্রহ। *নবরূপা, বুনন, প্রাইড, গ্রামীণ, আড়ং, নিপুণ,* অন্যান্য শাড়ি সম্ভার দেশীয় শাড়িতে জনপ্রিয়তার স্বাদ এনে দিয়েছে। দুইশ অথবা তিনশ টাকার মধ্যেই পাওয়া যায় মনের মতো শাড়ি। আমরা যারা হলে থাকি অনেক মেয়ে এক সঙ্গে, শাড়ি রীতিমতো এক গবেষণার বিষয়। কারণ নারী মানেই শাড়ি, আর হল জীবন মানে আনন্দ, দুঃখ, কান্না–হাসি ভাগাভাগি করে নেয়ার জীবন। হল জীবন মানে কিছু নিয়ম মেনে চলার জীবন। যেমন –

বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস, পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাগুন, ভালোবাসা দিবস, পিকনিক, নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা, র‍্যাগ ডে–তে শাড়ি পরা প্রায় বাধ্যতামূলক এবং সেই সঙ্গে

আছেন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার পিয়ারুভাই। সেই ১৯৫৩ সাল থেকেই যেন আমাদের হলে তিনি শাড়ি পরা নারীর ফটোগ্রাফির বিখ্যাত কাজটি করছেন।

হল জীবনের আরেকটি মানে হলো, সব কিছু শেয়ার করে নেয়া এবং সিরিয়াল মেনে চলা। যেমন রান্না, খাওয়া, গোসল, ওয়াশ, ফোন প্রতিটি কাজেই সিরিয়াল। আর আমাদের হল রুম সি সিরিয়াল মেইনটেন–এ ওস্তাদ। অভ্যাসটা এমন হয়েছে যে, কোথাও বেড়াতে গেলেও চেচিয়ে বলে উঠি, এ্যাই, সিরিয়াল। আরেকটি ব্যাপার নিয়ে আমাদের সিরিয়াল মানা হয়। তা হলো, প্রিয় পোশাক শাড়ি! হলের প্রতিটি বিকেল অনন্যাদের জন্য। আমাদের এই অনন্যারা প্রায় প্রতিটি বিকেলেই শাড়ি পরে বেড়াতে যায়, প্রিয় কারো হাত ধরে। কিন্তু প্রতিদিন বেড়ানোর মতো এতো শাড়ি কি আমাদের আছে? না, আমাদের প্রত্যেকেরই এক দুটি শাড়ি আছে এবং তাতেই পুরো রুম কভার, প্রতি শাড়িতেই সিরিয়াল। একটি শাড়ি মাসের প্রতিদিনই কোনো না কোনো ললনার অঙ্গ জড়াতে ব্যস্ত থাকে। এ ব্যাপারে আমরা সবাই পাক্কা বিউটিশিয়ান। হলফ করে বলতে পারবো, আমাদের তপতী, ঋতু, লিটা–র মতো চমৎকার শাড়ি পরাতে কোনো বিউটিশিয়ানও পারবে না। নিজের শখের শাড়িটি অন্য বধূদের দিতে একটুকুও কার্পণ্যও হয় না কখনো। হল জীবনের যতো কষ্টই হোক, কয়েকটি জিনিস শিখেছি। ত্যাগ, ধৈর্য, শেয়ার, সততা, শৃঙ্খলা, ভালোবাসা এবং এগুণগুলো কিভাবে বিলিয়ে দিতে হয় তা শুধু আমরা হলের মেয়েরাই বুঝি। প্রতিটি বিশেষ দিনে পরস্পরের হাত ধরে শাড়ি পরে অগ্রযাত্রা আমাদের পৃথিবীতে সাম্য হয়ে আনে। একটি শাড়িকে ভাগাভাগি করে নেয়ার মতোই আমাদের জীবন। অনেক ভালোবাসার আমাদের হল রুম।

পুরাতন হস্টেল, ইডেন কলেজ, ঢাকা থেকে

পাচ মিনিট

– উর্মি

আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্রী। আমাদের স্কুলের সবার মাঝে খুব আনন্দের ভাব। মাসটা ছিল মার্চ। ছাব্বিশ মার্চ চাটমোহর (আমরা যেখানে থাকতাম) সব স্কুলগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো। নাচ, শারীরিক কসরত ইত্যাদি।

আমাদের স্কুল দেবে নাচ। পুরো নাচটা আমিই শিখিয়েছি। সামনে দুইজন আর পেছনে অনেকগুলো। আমার এক বান্ধবী রুনা বললো, উর্মি, তুই আমাকে শাড়ি পরিয়ে দিবি। বললাম, আচ্ছা। ছাব্বিশ মার্চ সকাল সাতটার সময় রুনা চলে আসে আমাদের বাসায়। শাড়ি পরাতে বসে মহা ঝামেলায় পড়ি। আমিও জানি না, রুনাও জানে না কিভাবে শাড়ি পরতে হয়। অনেক সাধ্য সাধনা করে এক ঘণ্টা ধরে শাড়ি পরালাম। মনে মনে দুজনই খুশি। আমরা রিকশা করে স্কুলে এসে দেখি মোটামুটি সবাই এসে গেছে। আমরা স্কুলের বারান্দাতে দাড়াতেই সবাই খুব জোরে হেসে ওঠে। ব্যাপার কি! মুখ চাওয়া–চাওয়ি করছি। তখন আমাদের গার্হস্থ্য ম্যাডাম এসে বললেন, রুনা, উল্টো করে শাড়ি পরেছিস।

কি করবো, সময় নেই।

পাচ মিনিটে শাড়ি পরলাম।
পরে দুজনেই বললাম, কোথায় এক ঘণ্টা, কোথায় পাচ মিনিট!

পাবনা থেকে

রাঙাদিদি

এক্সকিউজ মি, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?
আরে! তুমি রাজা না, পলাশপুর গ্রামের সেই কিশোর ছেলেটি, দেখি একেবারে রবীন্দ্রনাথ সেজে বসে আছো।
হ্যা, আপনি ঠিক ধরেছেন। আমিই সেই রাজা। বলুন তো ঠিক কতোদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা?
তাতো প্রায় পনেরো ষোলো বছর হবেই। তা তুমি কেমন আছো বলো?
আগে আপনি কেমন আছেন বলুন?
আমার আর থাকা। বেচে আছি কোনো রকমে।
তিনিই আমার রাঙাদিদি। আজ থেকে পনেরো ষোলো বছর আগে আমরা এলাকার একই হাই স্কুলে পড়তাম। বয়সে সমান হলেও রাঙাদিদি আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরে বিধায় তাকে স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী সম্মানার্থে আপনি করেই বলতাম। এটা রাঙাদির আসল নাম নয়। রাঙাদির ক্লাস এইটের ফলাফলে কি ঝামেলা হয়েছিল। ফলে কিছুদিন তিনি ক্লাস এইটে আমাদের সঙ্গে ক্লাস করেন।
কৈশোর পেরিয়ে সদ্য যৌবনমুখী রাঙাদিদির গায়ের রঙটি ছিল দুধে–আলতা মেশানো। এই কালারটিকে স্থানীয়ভাবে আমরা *রাঙা* বলি। স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী রাঙাদিসহ অন্য সব মেয়েরা স্যারদের সঙ্গে ক্লাসে আসতেন এবং স্যারদের সঙ্গে চলে যেতেন কমন রুমে। একদিন ক্লাস শেষে রাঙাদির একটা বই বেঞ্চিতে রয়ে গিয়েছিল। বইটা হাতে নিয়ে আমি দুষ্টুমি করে নিচু স্বরে এই রাঙাদি আপনার বই বলে ডাক দিতেই তিনি একগাল হেসে, তুই খুব পাজি হয়েছিস, এটা কি কোনো নাম হলো?
একটু সাহস করে বললাম, আমি আপনাকে সব সময় এ নামেই ডাকবো। তিনি কিছু না বলে মৃদু হেসে অন্য মেয়েদের পিছু নিলেন। সেই থেকে তিনি আমাদের সবার প্রিয় রাঙাদিদি নামে পরিচিত।
চার বছরের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স আট বছরে শেষ করে বছর দুয়েক হলো একটি সেবা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছি। এর মধ্যে গবেষণা কাজে গভীর মনোযোগ দিয়েছি এবং কিছু উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফলও পেয়েছি। সেই সময়ে ডায়াবেটিক হাসপাতালে যা বারডেম নামে পরিচিত, কর্তৃপক্ষ একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করে। আমার পড়াশোনা ও গবেষণা কর্মের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকায় আমি এতে অংশ নিই।
রাঙাদি তার এই ছোট জীবনে নানান চড়াই উৎরাই পার হয়ে বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পিএ হিসেবে কাজ করছেন। সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিও এই সেমিনারের সঙ্গে জড়িত বলে দিদিকে রিসেপশন ডেস্কে দেখি।

দীর্ঘ দিন পর রাঙাদিদিকে দেখে আবেগ, বিস্ময়ে হতবাক হওয়ার পালা। দিদির সেই দুধে–আলতা রঙের শরীরে অযত্নের ছাপ দেখলাম। সেমিনারের কথা ভুলে দিদিকে নিয়ে এক কোণে চলে গেলাম। ঘোর পাওয়া মানুষের মতো দিদি তার জীবনের নানান ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা দিলেন। জানতাম না দিদি এতো কাঠ–খড় পুড়িয়ে আজ এ পর্যন্ত এসে পৌছেছেন। তার দেহলাবণ্য ছিল অপূর্ব। আর *আপনা মাংসে হরিণা বৈরী*–র মতো এ রূপ লাবণ্যই দিদির সামনে এগোনোর পথে কাটা হয়ে দাড়িয়েছিল। এমনকি তার শিক্ষক পর্যন্ত তার দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু দিদির অসীম ধৈর্য ও মনোবলের কারণে সকল বাধাকে পায়ে দলে এগিয়েছেন। কোনো ঘটনা বা রটনাই তাকে পিছু টানতে পারেনি।

কথায় কথায় জানলাম, ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে গিয়ে দুহাতে সংসারের হাল ধরেছেন বলে এখনো বিয়ে–থা করা হয়ে ওঠেনি। স্কুল পরিদর্শক বাবা অবসর নিয়েছেন দীর্ঘ দিন হলো। বাবার সামান্য পেনশনের টাকা আর নিজের রোজগার দিয়ে সংসার চালিয়ে নিচ্ছেন কোনো রকমে। এবং তা করতে গিয়ে নিজের সকল সাধ–আহ্লাদ বির্সজন দিয়েছেন। রিসেপশন ডেস্কে যে কজন মহিলা ছিল তাদের একজনের পরনে ছিল বেশ বাহারি রঙ ও ডিজাইনের একটি শাড়ি। দিদিকে অতি নর্মাল সালোয়ার কামিজ পরা দেখে আমি বললাম, দিদি ওই শাড়িটায় তোমায় বেশ মানাতো।

দিদি সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তার হতাশা গোপন করলেন। বুঝলাম, সাধ থাকলেও ওই রঙ ও ডিজাইনের শাড়ি কেনার সাধ্য দিদির নেই। কর্তৃপক্ষ লাঞ্চের ব্যবস্থা করলেও দিদিকে অনেকটা জোর করে বাইরে নিয়ে গেলাম এবং এলিফ্যান্ট রোডের একটি ছিমছাম হোটেলে লাঞ্চ সেরে ঘুরতে বের হলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমি তো বেশ টাকা রোজগার করি, খরচের জায়গা নেই, দিদিকে ওই রঙ ও ডিজাইনের একটি শাড়ি কিনে দিলে কেমন হয়! দিদিকে কিছু না বলে রিকশাচালককে আড়ংয়ের দিকে যেতে বললাম। অনেক ঘুরে অবশেষে মোটামুটি একই রঙ ও একটু ভিন্ন ডিজাইনের একটি শাড়ি পেলাম। শাড়িটি প্যাকেট করতে বললাম পাশে দাড়ানো সেলসগার্লকে। দাম পরিশোধ করে আমরা বেরিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা। সামনেই জাতীয় সংসদের বিশাল চত্বর। দুজন সেখানে গিয়ে বসলাম। আরো অনেক কথা হলো।

আমি উঠতে চাইলাম। কিন্তু দিদি আমাকে তার বাসায় যেতে অনুরোধ করলেন। দিদির কণ্ঠে কি ছিল জানি না, না করতে পারলাম না। রিকশায় করে দিদির শ্যামলির রিং রোডের বাসায় এলাম। তিন রুমের ছোট ছিমছাম বাসা। বাসায় এখন শুধু তার বাবা থাকেন। কিছুদিন হলো ছোট ভাইটি ঢাকা কলেজের হস্টেলে উঠেছে। আর একটি বোন রোকেয়া হলে থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ–তে পড়ছে। ছুটির দিনে সবাই বাসায় চলে আসে। দিদি নিজ হাতে তাদের জন্য ভালো–মন্দ রান্না করেন। মা দেশের বাড়িতে গিয়েছেন কিছুদিনের জন্য।

আমাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে দিদি ভেতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে নাশতা দিয়ে বললেন, তুমি বসো, আমি গোসলটা সেরে নিই।

কিছু পরে দিদি গোসল সেরে দুধে–আলতা রঙের নতুন শাড়িটা পরে, কপালে বড় টিপ দিয়ে এবং সেজেগুজে ড্রয়িংরুমে যে পা রাখলেন, আমি তো হতবাক। কোনো মেয়ে এতো সুন্দরী হয় তা আমার

জানা ছিল না। বললাম, এতো দেখি একেবারে রাজরানী সেজেছো। স্বর্গের উর্বশীরাও তোমায় এ রূপ ও সাজে দেখলে হিংসায় জ্বলে–পুড়ে মরবে।

দিদি চটজলদি জবাব দিলেন, তা রাজরানীকে একটু ছুয়ে দেখবেন না রাজা সাহেব!

সত্যি কথা বলতে কি, দিদির এরূপ দেখে তাকে আমারও ছুয়ে দেখতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না পাছে তিনি কিছু মনে করেন। তার এ আহ্বানে খানিকটা সাহসী হয়ে তার ডান হাতটা ধরে আলতো করে চুমু দিলাম, আর বললাম, গল্পে রানী ক্লিওপাট্রার রূপ যৌবনের বাহারি গল্প পড়েছি। কিন্তু তোমার এরূপ যৌবন দেখলে স্বয়ং ক্লিওপাট্রাও তাজ্জব হয়ে যেতেন।

দিদির চোখে জল চলে এলো। তার চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। তারপর বা হাতে তার মাথার পেছনে ধরে আর ডান হাতে তার চিবুকটা উপরে তুলে কপালে, দুচোখে, দুগালে ও দুঠোটে আলতো করে চুমু দিতে লাগলাম। দিদি দুচোখ বন্ধ করে শিহরে উঠছিলেন।

দিদির পক্ষ থেকে কোনো বাধা না পেয়ে আরো সাহসী হয়ে দিদির স্তনের মধ্যবতী উপত্যকায় চুমু দিতে গেলাম। দিদি নিজেকে সামলাতে না পেরে আমার মুখ তার বুকে চেপে ধরলেন। দিদিকে পাজা কোলে করে খাটে নিয়ে আসতে চাইলাম।

দিদি বাধা দিয়ে বললেন, রাজা সাহেব, প্রজারা দেখে ফেলতে পারে, একটু ধৈর্য ধরুন।

এ কথা বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দরজা লাগিয়ে দিলেন এবং শাড়িটা খুলে এক পাশে রেখে দিলেন। এদিকে আমার ভেতর চলছিল হাজার মাইল গতিবেগের ঘূর্ণিঝড়। সব কিছু মনে হচ্ছিল স্বপ্নময়। শাড়িহীন দিদিকে মনে হলো স্বর্গের উর্বশী মর্তে নেমে এসেছে।

তাকে আলতো করে শুইয়ে দিয়ে তার পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা, প্যান্টি একে একে খুলে ফেললাম। আর পায়ের আঙুল থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীর চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম। ত্রিশ বছরের অনাস্বাদিত অক্ষত যৌবনের অধিকারী দিদির শরীরে টাইফুনের সমুদ্রের মতো উথাল–পাতাল অবস্থা। তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। দিদির ভরা নদীতে আমি তখন অদক্ষ মাঝির মতো হাল ধরেছি। এটা আমারও জীবনের প্রথম ঘটনা।

গল্পে–উপন্যাসে পড়েছি, খাদ্য গ্রহণ আর সঙ্গম এ দুটি মানুষকে শিখিয়ে দিতে হয় না। ক্রমেই আমিও অদক্ষ থেকে দক্ষ মাঝিতে পরিণত হয়ে গেলাম।

দিদির অনুরোধে সে রাতে তার বাসায় রয়ে গেলাম। রাতে সোফায় বসে শুনলাম তার জীবনের চড়াই–উৎরাইয়ের কাহিনী। বিশেষ করে অপূর্ব সুন্দরী হয়েও কিভাবে তিনি নিজের সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে এক ভিন্ন লম্বা কাহিনী।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

জাপান থেকে

অতৃপ্ত

– শাহনেওয়াজ

অনেক দিন আগের কথা। দিনক্ষণ স্মৃতিতে নেই। তবে তার করুণা ভরা কথা আজো মনে পরে। পর পর পরীক্ষায় দুইবার ডাব্বা। অতঃপর এরশাদ সরকারের কল্যাণে কৃতকার্য। জীবন গড়ার জন্য রাজশাহী কলেজে ভর্তি। এভাবেই উপরের দিকে যাত্রা। ভালো ছাত্র কোনোদিনই ছিলাম না। পরিশ্রম ও বড় ভাই–ভাবীর কৃপায় ভালোই অগ্রগতি হতে লাগলো।

এগারো ভাইবোনের মধ্যে আমি পঞ্চম। নিদারুণ অভাবের সংসার। বৈবাহিক সূত্রে আব্বা প্রচুর সম্পত্তির মালিক। ছেলেমেয়ের পড়ার স্বার্থে সবই বিক্রি হয়ে গেছে। অবশেষ শুধু বসত–ভিটা। জামাই বাড়িতেই আমার নানি থাকতেন। মেয়ে, নাতি–নাতনির জন্য সব সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

টাকার জন্য প্রায়ই বাড়ি আসতাম। দুই একদিন বাড়িতেই কাটাতাম। গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া কারো সঙ্গেই তেমন সম্পর্ক ছিল না। এক প্রতিবেশী বন্ধুর কল্যাণে লিমার সঙ্গে পরিচয়। তারপর কথাবার্তা, বাড়িতে যাতায়াত। অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী এই লিমা। কথা কম বলে, শোনে বেশি। চললো এভাবেই অনেক দিন। এরপর ভালো লাগলো। আগ বাড়িয়ে সরাসরি প্রস্তাব। লিমা না বললো না। বললো, জানতাম। এভাবেই আমাদের ঐচ্ছিক প্রেমের সূত্রপাত।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যায় লিমা বিয়ের চাপ দেয়। বেকারত্ব, আত্মীয়স্বজনের ভয়ে পাশ কাটিয়ে যাই। মাঝে মধ্যে মান–অভিমান, কথা–বার্তা বন্ধ, যাতায়াত বন্ধ। প্রথমবার স্নাতক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো। লজ্জায় বাড়ি থেকে বের হতে পারতো না। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতো। দ্বিতীয়বার খুব পড়াশোনা করলো পরীক্ষাও দিল। পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বের হলো। আমি চাতুরী করে তাকে জানালাম, তুমি পাস করতে পারোনি।

কান্নায় ভেঙে পড়লো লিমা, শুধু কান্না আর কান্না। বৃষ্টির মতো কখনো মৃদু কখনো জোরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছে। আমি পাশের বাজার থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এলাম এবং বাড়ির অন্যদের মিষ্টিমুখ করালাম। লিমাকে মিষ্টিমুখ করালাম। বিশ্বাস করতেই পারছে না যে, সে পাস করেছে। এভাবেই এ পর্ব শেষ হলো।

তারপর আরো দুটি বছর পার হলো। একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেলাম। পড়াশোনা ও চাকরি দুই করতে লাগলাম। চারদিকে থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। কোনোটি প্রত্যাখ্যান করি, কোনোটি করতে পারি না। ইতিমধ্যে লিমার এক নিকট আত্মীয় আমাকে লিমাকে ভুলে যাবার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিল। লিমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। লিমাও আমাকে সহ্য করতে পারে না। উভয় সঙ্কটে পড়লাম। এভাবেই চললো প্রায় পাচ ছয় মাস।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা কয়েক বন্ধু জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ এক বন্ধু অন্য এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলো। আগ–পিছ না ভেবে বললাম, রাজি।

বিয়ে হয়ে গেল। নতুন স্ত্রী, নতুন সংসার। তিন বছরের মাথায় পুত্র সন্তান। এক কথায় সুখে দিন যাচ্ছে।

যাকে বিয়ে করবো বলে ভেবেছিলাম তাকে বিয়ে করতে পারিনি। ছয়টি বছর ভয়ে নির্ভয়ে চুটিয়ে প্রেম করেছি। অনেক যন্ত্রণা তাকে দিয়েছি। অনেক চোখের পানি ঝরিয়েছি। কিন্তু তাকে বিয়ে করিনি।

বিয়ের দিন লিমা বাড়িতে ছিল না। দুই চার দিন কোথায় লুকিয়ে ছিল। শোককে শক্তিতে পরিণত করেছে। চাকরি পাওয়ার সংগ্রাম করছে। অবশেষে চাকরি পেল। নতুন প্রেমিকও পেল। কিন্তু তাকেও বিয়ে করলো না। শেষ পর্যন্ত আমারি পরিচিত একজনকে বিয়ে করলো। লিমা বড় প্রতিশোধ নিল।

কিছুদিন পর প্লাজা মার্কেটে তার দেখা পাই।

সে বললো, ভাই কেমন আছেন? ভাবী কেমন আছে।

হকচকিয়ে গেলাম। কথার উত্তর দিতে পারলাম না। চুপ করে থাকলাম অপলক দৃষ্টিতে।

শাড়ি কিনতে এসেছি। চলুন শাড়ি কিনে দেবেন।

পাশের দোকানে বসলাম। অনেক শাড়ি দেখলো। কোনোটিই তার পছন্দ হলো না। একটি হালকা গোলাপি রঙ–এর শাড়ি নিয়ে বললাম, এটি তোমাকে খুব মানাবে। লিমা মৃদু হাসলো। দুইজন শাড়ি নিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। অনেক পথ চলেছি। কেউ কথা বলতে পারছি না। লিমা হাসি হাসি দৃষ্টিতে বললো, আমাকে মনে পড়ে?

তোমার স্মৃতি কি মনে না পড়ার মতো? বললাম।

তোমাকে দোষী করতে চাই না। তোমাকে কষ্ট দিতেও চাই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার কথা মনে করবে। এটাই তোমার শাস্তি।

বললাম, তোমাকে বিয়ে করতে পারিনি এর জন্য তুমি...।

না, না তুমি এ চিন্তা করো না। বড় প্রেম বলেই মিলন হয়নি। এখন পুরনো স্মৃতিচারণ করে কি লাভ? বিদায়। বলে লিমা রিকশায় চাপলো।

তার প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সে চলে যাচ্ছে। হাজারো স্মৃতি মনের পর্দায় ভাসতে লাগলো।

মন থেকে ভাবনা দূর করতে পারি না। কি কারণে লিমাকে বিয়ে করতে পারিনি লিমাও জানতে চায়নি, আমিও বলতে পারিনি। এই কি অতৃপ্ত প্রেম?

চাচকৈড়, নাটোর থেকে

বহুরূপী

– মোশারফ হোসেন লিটন

যখন খুব ছোট তখন মা আমাকে শাড়ির আচল দিয়ে ঢেকে রাখতেন।

যখন তার চেয়ে একটু বড় হলাম তখন আচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিতেন।

যখন আরেকটু বড় হলাম তখন মায়ের আচল ধরে তার পেছন পেছন ঘুরতাম।

তারপর যখন আরেকটু বড় হলাম তখন আচল কামড়াতাম।

এরপর যখন আরেকটু বড় হলাম অর্থাৎ বুঝতে শিখলাম তখন মায়ের আচলের গিট থেকে টাকা চুরি করতে লাগলাম।

তারপর যখন আরেকটু বড় হলাম তখন ভাত খেয়ে হাত মুখ মুছতাম শাড়ির আচলে।

এরপর যখন আরেকটু বড় হলাম তখন বাবার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মায়ের আচলের তলায় লুকাতাম আর চোখ মুছতাম।

তারপর আরেকটু বড় হয়ে মায়ের আচল ছিড়ে পকেটে রাখতে লাগলাম।

এখন আমি কতোটা বড় হয়েছি জানি না। তবে এখন প্রেমিকার আচল নিয়ে টানাটানি করি।

কিছুদিন পরে হয়তো নিজেকে স্ত্রীর আচলের নিচে আবিষ্কার করবো।

আমি ভাবি, একই আচলের কতো ব্যবহার! এর কতোই না রূপ।

ঢাকা সেনানিবাস, ভাষানটেক থেকে

র‍্যাগ ডে–র পরে

– এস কবীর

দশটি বছর কেটে গেল। তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। নব্বইতম ব্যাচের র‍্যাগ ডে চলছিল। বিভিন্ন হলের ছেলেরা সেজেছিল বিভিন্ন ঢঙ–এ। রোকেয়া হলের মেয়েরা সেজেছিল এক বর্ণিল ঢঙ–এর শাড়ি পরে। লাল পাড়, হলুদ জমিন, তার ওপর মেরুন রঙের লম্বা আড়াআড়ি Step এক ঝাক মেয়েকে দেখাচ্ছিল যেন একদল রঙিন প্রজাপতি, কোনো ফুল বাগানে শীতের সকালে এফুল থেকে ওফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমি দূরে দাড়িয়ে তার শোভা উপভোগ করছি।

আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে এনজয় করছিলাম বড়দের সঙ্গে র‍্যাগ ডে। এরই ফাকে মনের অজান্তে ঘটে গেল এক আজব ঘটনা। আমার দৃষ্টি পড়লো এক বড় আপার দিকে। ওই বড় আপা ওই ব্যাচের সবচেয়ে সুন্দরী নন। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল বিধাতা তার নিজ হাতে তৈরি করেছেন এই মায়াময়ী চেহারা, টানা টানা দুচোখ, সুচালো নাক আর আকর্ষণীয় সুউচ্চ বক্ষদেশ।

শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে পরা হালকা বেগুনি রঙের ব্লাউজের নিচের অংশের মেদহীন নিতম্ব। হায়, আমি একি দেখছি! এ যে আমারই সেই কল্পনার রানী ঠিক যেমনটি আমার হৃদয়ে আকা। আর সেই চিত্রটিকে পূর্ণতা দিয়েছে হলুদ জমিনের সেই শাড়িটি। ব্যাপারটি কাউকে বুঝতে না দিয়ে রুমে ফিরে এসে বেডে বসে পড়লাম এবং দৃষ্টি দিলাম জানালা দিয়ে ঠিক নীল আকাশের দিকে।

মাথা ঘুরপাক খেলতে লাগলো। মনের অজান্তেই বাম হাতে অনুভব করলাম এক ফোটা অশ্রু। এই সেই শাড়ি যে শাড়ি আমার মনের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারবে। সেদিন আর কোনো কাজ করতে পারলাম না। অপেক্ষা করতে থাকলাম বিকাল পাচটা বাজার জন্য, যখন বিআইটি–র গাড়িতে করে শহরে আসতে পারবো। শহরে এলেই কি হবে। নিউ মার্কেট, বাবর মার্কেট, ডাকবাংলোর প্রতিটি দোকানে তন্ন তন্ন করে খুজলাম। কিন্তু ওই একই শাড়ি পেলাম না। মাথা আর কাজ করতে পারছিল না। মেয়েদের হলে ফোন করলাম এবং এক বড় আপার কাছে সেই র‍্যাগ ডে–তে পরা শাড়িটি কোথায় পাওয়া যায় তা জানতে চাইলাম।

বড় আপা তো হাসিতে আটখানা। পাগল ছেলে, তুমি শাড়ি দিয়ে কি করবে!

প্রতিটি কথা যেন এক একটি তীর হয়ে বুকে বিধতে লাগলো।
তিনি সহাস্যে জানালেন ওই শাড়ি অর্ডার দিয়ে তৈরি করা।
পায়ের নিচের মাটি সরে গেল। বুঝতে পারলাম তাকে পুরো ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে কাজ হতেও পারে অর্থাৎ রি-অর্ডার দিয়ে আরেকটি শাড়ি সংগ্রহ করা যাবে। লজ্জা ঝেড়ে ফেলে টেলিফোনেই পুরো ব্যাপারটি খুলে বললাম। এ সেই শাড়ি যে শাড়িই আমার স্বপ্নের রানীকে পূর্ণতা দিতে পারবে। কিন্তু কিছুই করার নেই। সেদিন হতাশ হয়ে হলে ফিরলাম। অনেক টেনশনে প্রায় চার মাস কেটে গেল।
বড় ভাইয়ারা হল ছেড়েছেন। একদিন এক রিকশাচালক এক চিরকুট নিয়ে হাজির। আমাকে ওই বড় আপা বিকাল তিনটায় লাইব্রেরিতে দেখা করতে বলেছেন। অনেক চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনটা বাজার অনেক আগেই লাইব্রেরিতে হাজির। বড় আপা ঠিক তিনটার এলেন এবং মুচকি হাসি হাসলেন। ব্যাপারটি চিন্তাও করতে পারছি না, কেন তিনি ডেকেছেন। জুনিয়র কেউ হলে হয়তো প্রেম নিবেদনের সম্ভাবনা থাকতো। ইয়ার মেট হলে হয়তো নোট বা খোশগল্পের ব্যাপার থাকতো। কিন্তু তিনি তো বড় আপা। তিনি আমাকে তার খুব কাছে বসতে বললেন এবং সেদিনের টেলিফোনের সেই ঘটনা জানতে চাইলেন।
তাকে পুরোপুরি খুলে বললাম তিনি দ্রুতগতিতে উত্তর দিলেন, ঠিক এ জিনিসটিই তিনি ভেবেছেন। যাওয়ার সময় তিনি আমার হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন এবং রুমে গিয়ে খুলতে বললেন। কম্পিত হস্তে প্যাকেটটি নিয়ে রুমে ফিরে এলাম।
রুমে গিয়ে রুমমেটরদের জন্য প্যাকেটটি খুলতে পারছিলাম না। না জানি কেউ ব্যাপারটি জেনে যায়। প্যাকেটটি নিয়ে বাথরুমে গেলাম। কিন্তু না, বড় আপার দেয়া ওই প্যাকেটটি বাথরুমে খুলতে দ্বিধা বোধ করছিলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন রুম পুরোপুরি ফাকা হয় বা কখন সবাই ঘুমিয়ে যায়। অনেক অপেক্ষার পর কাঙ্ক্ষিত সময় এলো। রাত তিনটা। সারা হল নিস্তব্ধ এবং রুমমেটরা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এমন সময় খুবই সাবধানে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে সেই রহস্যময় প্যাকেটটি খুললাম। এটি আর কিছুই নয়, এটি সেই র‍্যাগ ডে-তে পরা আমার কল্পনার শাড়িটি। উপরে একটা চিরকুট। তাতে লেখা, তোমার জন্য এই শাড়িটি অনেক কষ্টে রি-অর্ডার দিয়ে সংগ্রহ করেছি।
সমস্ত শরীরে রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেল। কৃতজ্ঞতায় মাথা হেট হয়ে গেল। চোখ দিয়ে ঝরে পড়লো ঝরনাপ্রবাহের মতো অশ্রু জল। সে জল কোনোক্রমেই আটকাতে পারছিলাম না। সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। পরদিন ক্লাসে না গিয়ে চলে গেলাম রোকেয়া হলে বড় আপার সঙ্গে দেখা করতে কৃতজ্ঞতা জানাতে। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হলো না। কারণ বড় আপা গতকালই হল ছেড়ে চলে গেছেন।
এরপর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। স্মৃতি স্বরূপ রয়ে গেছে তার দেয়া সেই শাড়িটি। দেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ইনজিনিয়ার হিসেবে অনেক দায়িত্ব পালন করছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও স্মরণ করি সেই বড় আপাকে। তার দেয়া শাড়িটি সেই প্যাকেটসহ আজো রয়ে গেছে। কিন্তু আমার স্বপ্নের রানীর খোজ আজো মিলেনি। কবে যে নিজ হাতে পরিয়ে দেবো সেই শাড়িটি।

ইউনোক্যাল থেকে

ঘোমটা

– রিপা

সবেমাত্র ক্লাস নাইনে উঠেছি। ২০০২ সালের কোরবানির ঈদে শখের বসে পরেছিলাম একটি লাল শাড়ি এবং এ শাড়ি পরেই হয়ে গেলাম নতুন বৌ।

ওই দিন সকালবেলা গোসল করে নতুন জামা পরেছিলাম বান্ধবীদের সঙ্গে বেড়াতে বের হবো এই উদ্দেশে। কিন্তু যখন দেখলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় মিঠুআপু শাড়ি পরেছেন ঠিক তখনই আমিও পরে নিলাম একটি লাল শাড়ি।

জীবনে প্রথম শাড়ি পরাতে লজ্জায় আর কোথাও বের হলাম না। তখন আমার চাচাতো ভাই, মেজআপু ও ছোট বোন জুই বড়কাকুদের বাসায় গেল বেড়াতে। আমারও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া হলো না।

বড়কাকুর মেয়ে রিশা আমার খুব ভালো বান্ধবী। রিশা যখন দেখলো যে, ভাইয়াদের সঙ্গে আমি নেই তখন খুব রেগে গিয়ে ঘরে দরজা দিয়ে বসেছিল। তখন ভাইয়া গিয়ে বললেন, রিশা জানিস, শাড়ি পরেছে রিপা।

তখন দরজা খুলেই রিশা বললো, কি বললেন, শাড়ি পরেছে রিপা? তার রাগ মুহূর্তেই মাটি হয়ে গেল। তখন রিশাও একটি লাল পাড়ওয়ালা সবুজ শাড়ি পরে আমাদের বাসায় এলো। তার সঙ্গে ছিল চাচাতো ভাই জীবন ও চাচাতো বোন রিতু। জীবন ভাইয়া সেবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

জীবন ভাইয়া এসেই আমার সঙ্গে ইয়ারকি করা শুরু করে দিলেন। বলতে লাগলেন রিপা, তোমাকে আজ একটি নতুন বৌয়ের মতো লাগছে। তো কার বৌ? নিশ্চয়ই আমার।

লজ্জায় আর জীবন ভাইয়ার সামনে যাইনি। যখন তারা চলে যাবে তখন জীবন ভাইয়া আমাকে বললেন, আমাদের এগিয়ে দিতে যাবে না?

আমি তো যাবোই না, রিশা আমাকে জোর করে নিয়ে গেল। রিশা আর রিতু ছিল সামনে তার পেছনে ছিলাম আমি এবং জীবন ভাইয়া।

জীবন ভাইয়া বললেন, রিপা, তোমার যদি লজ্জা লাগে তাহলে বড় করে ঘোমটা দাও।

আমি ওনার কথা মতো বড় করে ঘোমটা দিলাম। হঠাৎ রিশার এক দাদির সঙ্গে দেখা। জীবন ভাইয়াকে দাদি বললেন, দাদু বিয়ে করলে কবে? আমাকে তোমার বৌকে একটু দেখাও না?

জীবন ভাইয়া বললেন, এই তো দাদি, কিছুদিন হলো বিয়ে করেছি। কিন্তু বৌ আমার বড়ই লজ্জাবতী। তাই বলছিলাম, পরে দেখো দাদি। এটা বলেই আমার হাত ধরে বললেন, এসো রিপা।

কিছু দূর যাওয়ার পর বললাম, থামুন তো ভাইয়া। তখন জীবন ভাইয়া বললেন, এই, স্বামীকে আবার কেউ ভাইয়া বলে ডাকে নাকি?

কে আমার স্বামী, বলেই ওনার চোখের দিকে তাকালাম।

হঠাৎ জীবন ভাইয়া আমার ঠোটে একটি চুমু বসিয়ে দিনে বললেন, তুমি আমার বৌ হবে না!

সেই থেকে আমরা দুজন একই পথে চলছি। কাকু আর কাকিমা আমাকে জীবনের বৌ করার জন্য অপেক্ষায় আছেন। জীবনও আমার পড়াশোনাটা শেষ হলেই আমরা বিয়ের পিড়িতে বসবো এবং তখন সত্যিই হয়ে যাবো লাল শাড়ি পরা নতুন বৌ।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ডুমুরিয়া, খুলনা থেকে

পাশাপাশি

– শামীমা ইসলাম

সেদিন ছিল পহেলা জানুয়ারি ২০০২। সেদিনের ভোরটি ছিল আমার জীবনের প্রথম বহু প্রতীক্ষিত একটি ভোর। রাতে অস্থিরতায় কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেল। প্রতিবারই দেখতে পেলাম এখনো ভোরের আলো ফোটেনি। সেদিন বোধ করি ভোরের আলো একটু দেরিতে ফুটেছিল শুধু আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য। তবুও সব কষ্ট সয়ে নিয়েছি একমাত্র আমার নিলয়ের জন্য।

আমার গল্পের নায়ক, আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু নিলয়।

এটা অবশ্য আমার দেয়া নাম। যাহোক, খুব ভোরে উঠে সোজা চলে গেলাম তার রুমে। গাছ থেকে তাজা একটি ফুল নিয়ে বললাম, হ্যাপি নিউ ইয়ার।

ও হো! বলে সে হঠাৎ লাফ দিয়ে দাড়ালো। আমার একদম খেয়াল ছিল না।

আমাদের তখন এইচএসসি টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। সে ইংরেজি পড়ছিল। বললাম, তাতে কি হয়েছে। আমি এখন যা বলবো তা করবে।

কি সেটা?

তার দিকে আমার বাড়ানো হাতটা দেখিয়ে বললাম, সকালবেলা খালি হাতে, তাছাড়া বছরের প্রথম দিন আমাকে ফিরিয়ে দিও না। আমার হাতে একটা কিস দাও।

সে বললো, হাতে নয়।

তাহলে কোথায়?

এর জবাব পাবার আগেই একজন লোক এলো তার কাছে। ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এলাম।

তারপর দুজনেই ভালো ভাবে পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরলাম। সে খুব শাড়ি পরা পছন্দ করে। তাই ভাবলাম, আজ নববর্ষ। তার পছন্দের কাজটাই করি। এই ভেবে ওই দিন শাড়ি পরলাম। খুব একটা কখনোই সাজি না। সেদিনও তার বিপরীত নয়। শুধু কপালে একটা টিপ পরলাম। চুলগুলো ছাড়া। পেস্ট কালারের একটা শাড়ি পরনে। চলে গেলাম তার রুমে। সামনে দাড়ানো মাত্রই সে হা করে তাকিয়ে রইলো। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো?

সে যেন সে কথা শুনলো না। শুধু বলতে লাগলো, ভেরি ফাইন, ভেরি ফাইন।

তাকে মৃদু তিরস্কার করলাম, আজ আত্মহারা হয়ে গেলে নাকি?

তারপর পরবর্তী পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। তার মাঝে ও বার বার বলতে লাগলো, নববর্ষ কিন্তু শেষ হতে যাচ্ছে।

তো কি হয়েছে? তোমার জন্য বসে থাকবে নাকি? আমার পাল্টা প্রশ্ন।

তারপর চুপচাপ কাটলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ সে বললো, কানে কানে একটা কথা শোনো।
আচ্ছা, বলো বলে কান এগিয়ে দিতেই গালের মধ্যে হালকা স্পর্শ অনুভব হলো।
এই তাহলে ঘটনা!
ভেবেছিলাম সকালে যা দাবি করেছি ও সেটা অন্যভাবে নিয়েছে। আমাকে খারাপ ভাবছে। কিন্তু এখন দেখি আমার চেয়ে ও আরো বেশি...।
আমরা দুজনে ক্লাসমেট কিন্তু ভালো বন্ধু। ছাত্রী অবস্থায় মেয়েরা খুব কমই শাড়ি পরে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে ইদানীং সে যখন গ্রামের বাড়ি যায় তখন কোনো অনুষ্ঠানেও শাড়ি পরি না। আর সে যখন আমার কাছাকাছি থাকে তখন এমনি এমনি শাড়ি পরি।
আর মাত্র দুই মাস আমার সঙ্গে সে থাকবে। তারপর চলে যাবে তার নিজ গন্তব্যে। হয়তো তখন দেখা হবে খুব কম। এখন পড়াশোনার খাতিরে পাশাপাশি আছি। কলেজে যাই। এক সঙ্গে চলাফেরা করি। যখন সে চলে যাবে তখন আমি থাকবো কি করে?
এবং অদূর ভবিষ্যতে যখন আমার ঘর সংসার হবে তখন শাড়ি পরবো কিভাবে? তখন যে সারাক্ষণ তাকে পাশে রাখতে ইচ্ছা করবে।

মাদারীপুর থেকে

রক্তে কেনা

– জে. আলম ফারুক

বয়সের কারণেই হোক আর যোগ্যতার অভাবেই হোক, আমার প্রিয়তমাকে যে আমি হারিয়ে ফেলেছি এটাই এখন আমার জীবনের চরম সত্য।
একটা নির্দিষ্ট বয়সে এসে কম বেশি সবাই প্রেমে পড়ে। কেউ পড়ে বারো বছরে, কেউ পড়ে এরশাদের মতো পচাত্তর বছরে। আমি যখন প্রেমে পড়েছিলাম তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। এর আগেও যে পড়িনি তা নয়। আমরা তখন একই সঙ্গে ইংরেজি প্রাইভেট পড়ি। ওই ব্যাচের আমি ছিলাম সর্বশেষ ছাত্র।
যেদিন থেকে পড়তে শুরু করি সেদিন ছিল দুই জুন। প্রথম দিনই ওর কণ্ঠ শুনে প্রেমে পড়ে যাই। এক দিন–দুই দিন–তিন দিন প্রেম থেকে আমরা অতি শিগগিরই পাড়ি দিই ভালোবাসার ব্যস্ত সাগরে। সুন্দর রূপ ও গুণের কারণে মাঝে মধ্যেই রূপার বিয়ে আসতে থাকে। এভাবে আসতে আসতে একদিন প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম ইচ্ছায় রূপার হাতে রিং পরিয়ে দেয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানদের একজন।
অবস্থানগত দূরত্বের কারণে এই দুঃসংবাদটাও শুনতে পাই সাতদিন পর বন্ধু রাশেদুলের চিঠির মাধ্যমে। চিঠিতে আরো জানতে পারলাম বিয়ের তারিখ এবং আমি বিয়েতে না গেলে সে যে শশুরবাড়ি যাবে না তার অশনি সংকেত। বিয়ের অনুষ্ঠানের আর মাত্র পচিশ দিন বাকি।
প্রিয় মানসীকে হারানোর শোক সামলাতে না পেরে সামান্য অসুস্থ হয়ে গেলাম। সুস্থ হতে বেশ কিছুদিন শেষ হয়ে গেছে। আর মাত্র কয়টা দিন বাকি। আমি নিশ্চিত আমার অনুপস্থিতিতে রূপা শ্বশুরবাড়ি যাবে না। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। মনকে বোঝালাম, তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে ছেড়ে দাও, সে যদি তোমার হয় অবশ্যই ফিরে আসবে।

হঠাৎ করে মাথায় এলো রূপাকে তো অবশ্যই কিছু দিতে হবে। কি দেবো আমার পার্বতীকে? মনে মনে ভাবলাম রূপাকে এমন কিছু দেবো যা সে আজীবন আগলে রাখবে। এবং সেটা হবে অবশ্যই আমার উপার্জনের পবিত্র টাকা। কিন্তু আমার উপার্জনের টাকা কোথায় পাবো। আমার সব টাকা তো আমার বাবার দেয়া। দিনও তেমন বেশি নেই।

মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত মাথায় আসে যদিও তা ঝুকিপূর্ণ। তাতে কি! না হয় রূপার জন্য একটু ঝুকিই নিলাম। তার জন্যই ঝুকি নেয়া যায় যাকে ভালোবাসা যায়। আমি তো রূপাকে আজো ভালোবাসি, ভালোবাসবো আজীবন। এতো অল্প সময়ে টাকার কোনো ব্যবস্থা না হওয়াতে ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্ত বিক্রি করলাম। আমার শরীরের রক্ত বেচা টাকা পবিত্র ছিল কি না জানি না। তবে সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল এর চেয়ে পবিত্র পৃথিবীতে কিছুই নেই।

রক্ত বিক্রির সমস্ত টাকা দিয়ে রূপার জন্য একটা লাল টুকটুকে বেনারসি কিনলাম। আমি জানি, আমার এ উপহার রূপা না পারবে শরীরে জড়াতে, না পারবে আলমারিতে সাজাতে। এ যে আমার ব্যাথার দান। বিয়ের আগের দিন রাতে আমার ব্যথার দান আমার মেমসাহেবের হাতে পৌছে দিলাম। বিয়ের দিন বন্ধু কনক, ফারুক, ফরিদ, বুলবুল, স্বপন, তিথী, সুসমিতা, পারভীন, বিউটি সবাই খুব মজা করলাম। এমন অভিনয় করলাম সারা দিন সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল আমিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

রাত সাড়ে নয়টা। আমাকে পেছনে ফেলে রূপার বিয়ের গাড়িটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হলুদ ফুলে সাজানো ওই গাড়ির লাল যাত্রীর জন্য আমি আজো পথ চেয়ে বসে আছি, থাকবো যতোদিন বেচে আছি।

শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ থেকে

মরণ ফাদ

– সাবেরা সুলতানা জলি

বাঙালি ঐতিহ্যে সকল অনুষ্ঠানে শাড়িই প্রধানত কুমারী তরুণীদের পরনের বস্ত্র। ঠিক তেমনিভাবে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তার মোটর সাইকেলে করে বন্ধুর কোমর পেছন থেকে পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। বিভিন্ন গল্প করতে করতে দৈহিক উত্তেজনায় পেছন থেকে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম। কিন্তু বিধাতা মনে হয় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রবল উত্তেজনায় জ্ঞান হারা হয়েছিলাম মনে হয়। এক পর্যায়ে শাড়ির আচল মোটর সাইকেলের পেছনের চাকায় জড়িয়ে যায়। এক পলকেই আমার সম্পূর্ণ শাড়ি খুলে নিরাবরণ হয়ে ছিটকে মোটর সাইকেল থেকে পড়ে হাত পা ভেঙে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর এখন প্রায় সুস্থ। এখন মনে হয়, শাড়ির অপর নাম *মরণ ফাদ* নয় কি?

সমগ্র মেয়ে জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই যেন মোটর সাইকেলে বসে কখনো আবেগকে প্রশ্রয় দেবেন না।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

বিব্রতকর

– জসীম মাহমুদ

কল দিয়ে লেডিস হলের সামনে দাড়িয়ে থাকা যে কতো অস্বস্তিকর ব্যাপার তা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে, বিশেষ করে যাদের ঘন ঘন এই ডেঞ্জার জোনে আসার প্রয়োজন পড়ে। আমার অবশ্য অভ্যাস আছে। দুই বছর ধরে এ প্র্যাকটিসটা নিয়মিত করে যাচ্ছি। তারপরও আজ বেশ বিরক্তিকর লাগছে। আসছি বলে লাবনী সেই যে গেল এখনো ফেরার নাম নেই। তবে যতোই খারাপ লাগুক, আমি জানি আজ সব কিছু হাসিমুখে সয়ে যেতে হবে। আজ ছাব্বিশ মার্চ বিশেষ দিন। আজ লাবনীর জন্মদিন।

কাটায় কাটায় পয়ত্রিশ মিনিট পর মহারানীর দয়া হলো। তিনি এলেন। মুখে তার সেই পুরনো ধারালো মরণঘাতী অস্ত্র, ভুবন ভোলানো মোহময়ী মিষ্টি হাসি, যার এক ঘায়ে আমার কলিজা ছ্যারা–ভ্যারা, পুরো দুনিয়া তোলপাড়। তবে এখন আমার সেদিকে তাকানোর অবকাশ নেই। লাল পাড়ের সবুজ শাড়ি, ম্যাচ করা ব্লাউজ, সবুজ টিপ পরা আমার সামনে দাড়ানো অনন্য সুন্দরী এই মেয়েটিকে দেখিনি কখনো। তাকে চিনি না। চিনি শুধু তার সেই হৃদয় কাপানো হাসি। এই প্রথম লাবনীকে শাড়ি পরতে দেখলাম। অপূর্ব! বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকি তার দিকে। মুখে কথা সরে না। ভুলে যাই বিশাল ভুড়িওয়ালা জাম গাছের নিচে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে ব্যথা ধরার কথা। ভুলে যাই এই পাগলি মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করে জীবনের মস্ত বড় ভুল করেছি এ রকম অর্থহীন আফসোসের কথা।

লাবনী কিছু বলছে না। আমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দেখে সে মিটিমিটি হাসছে। চোখে মুখে তার গর্বিত ভাব উপছে পড়ছে। এখন আমার মনে একটি বদ ইচ্ছা জাগছে। ইচ্ছা করছে লাবনীকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেশে একটি চুমু একে দিই তার কমলার কোয়ার মতো অধরে। কিন্তু তা অসম্ভব। শুধু বেমানান পরিবেশের জন্যই নয়, এ হাড় কৃপণ মেয়েটা এ অধিকারটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে, আমাকে এখনো দেয়নি। কি আর করা! মনের ইচ্ছা মনে চেপে রিকশায় উঠি। পাশে লাবনী। উদ্দেশ্য, আম বাগান।

আসলে আম বাগান তথাকথিত কোনো বাগান নয়। বেশ লম্বা একটি পাকা রাস্তা। তার দুই পাশে সারি সারি আম গাছ। এটাই হলো ক্যাম্পাসের অতি পরিচিত আম বাগান। তবে যাই হোক, নামকরণ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও জায়গাটার সৌন্দর্য আর নিরিবিলি ছায়াময় পরিবেশ যে অনেককে মুগ্ধ করে এতে সন্দেহ নেই। আমাদের মতো যারা নির্জনতা পছন্দ করে তারা এখানে প্রায়ই বেড়াতে আসে।

আমরা রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে গা ঘেষে বসে পড়ি। বহুবার চর্চিত পুরনো কথাগুলো আবার জাবরকাটি। মাঝে মধ্যে চলে খুনসুটি।

কিছুক্ষণ পর আমরা উঠে দাড়াই। পাশাপাশি হাটতে থাকি। হঠাৎ লাবনী হোচট খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। আমার বাম হাতে তার ডান হাত থাকাতে ধরে ফেলি। তবে সর্বনাশ যা হওয়ার ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। কিভাবে যেন লাবনীর হাই হিলের নিচে শাড়ির আচল চলে যায়। এবং তাতেই খুলে যায় শাড়ি। লাবনী তাড়াতাড়ি বাম হাত দিয়ে শাড়ি ধরে বসে পড়ে। ঘটনার

আকস্মিকতায় দুজনেই হতবিহ্বল হয়ে যাই। আমি চকিত তাকিয়ে দেখি। না কাছাকাছি লোকজন নেই।

এখন উপায় কি! লাবনী আগে কখনো শাড়ি পরেনি। এমনকি পরতেও জানে না। আজ শখ করে রুমমেটের শাড়ি পরেছে। রুমমেটই নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছে। লাবনীর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বেচারির সুন্দর ফর্শা মুখটা একদম আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো করে জড়সড়ো হয়ে বসে আছে। টেনশনে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

আমার এখন কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না। বোকার মতো লাবনীর দিকে তাকিয়ে আছি। দুই চারজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের দিকে কেমন জানি চোখে তাকাচ্ছে।

ইতিমধ্যে লাবনী মাঝ রাস্তা থেকে কোনো রকমে সরে গিয়ে পাশের একটি গাছের আড়ালে বেকায়দায় বসে পড়েছে। যতোই পেচিয়ে–পুচিয়ে পরতে যায় ততোই যেন শাড়ি আরো খুলে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর লাবনীর পরামর্শ মতো আমি জুটি খুজতে বের হই। মনে মনে আশা যদি কোনো মেয়ে শাড়ি পরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু হতাশ হতে হলো। দুইটা জুটিকে পেয়েছি বটে এবং লজ্জা উপেক্ষা করে তাদের কাছে ব্যাপারটি খুলে বলেছি। কিন্তু কেউ কোনো কাজে আসেনি। হায়! আধুনিক বাঙালি নারী। পাশ্চাত্য কালচার তো সব নখদর্পণে শুধু সামান্য শাড়ি পরার ব্যাপারে অজ্ঞতা। শুনতে বড় দুঃখ হয়।

অন্তত একটা রিকশা পাওয়া গেলেও হতো। লেডিস হল পর্যন্ত যেতে পারলে পরে আর অসুবিধা ছিল না। অন্যদিন এখানে দুই চারটা রিকশা পাওয়া যায়। অথচ কি কপাল, আজ ঠেকার সময় একটাও নেই।

লাবনী গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে কেন যে আজ শাড়ি পরতে গেলাম বলে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে। আহা বেচারি! শাড়ি পরে যতো না আনন্দ পেয়েছে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে এই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। কারণ আজ আমাদের আরো পরিকল্পনা ছিল। এখানে ঘুরে শহরে যাবো। দুপুরবেলায় *খন্দকার*–এ খাবো। পরে ক্যাম্পাসে ফিরে নৌকায় চড়ে ব্রহ্মপুত্র নদে ঘুরে বেড়াবো পুরো বিকেল। সব মাঠে মারা গেল।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর একটা জুটিকে নিয়ে আসা রিকশায় আমরা লেডিস হলে আসি। লাবনী অপরাধী মুখ করে ভেতরে চলে যায় কোনো রকমে সবার প্রশ্নবোধক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। আজ আর বের হবে না সে।

একবার মুড অফ হলে সেটা ফিরে আসতে তার সময় লাগে। কি আর করা! অপয়া শাড়িটাকে অভিশাপ দিতে দিতে হলে ফিরি।

ময়মনসিংহ থেকে

একই ইসু

আনলাকি থার্টিন সেপ্টেম্বর ২০০১–এ আমাদের শুভবিয়ের কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল। নানান ঘাত–প্রতিঘাত, লাঞ্ছনা–বঞ্চনা সয়ে নিয়ে এবং বাবা–মা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন সবার বাধা উপেক্ষা করে আমরা দুজনে বিয়ে করেছি।

অবশ্য দুইপক্ষের মায়েরা উপস্থিত থেকে কাজি ডেকে, স্বল্প পরিসরে এবং ঘরোয়াভাবে বিয়েটা সম্পন্ন করেছিলেন। নানান দুশ্চিন্তা, লুকোচুরি ও তড়িঘড়ির মধ্যে যৎসামান্য প্রসাধনী, শাড়ি–চুড়ি এবং গহনাপাতি কিনেছিলাম বিয়ের আগের দিন।

বিয়ের আসরে ওই যৎসামান্য গহনাপাতি ও বিয়ের শাড়িতে তাকে যে কি অসাধারণ লাগছিল তা লিখে বোঝানোর ভাষা আমার পক্ষে রীতিমতো অসম্ভব।

অর্ধযুগ ধরে যাকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে আসছি সেই তাকে বৌ করে পাওয়ার অসীম সুখের অনুভূতি তুলনাহীন। আমার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল যখন বড় পরিসরে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে তখন তাকে মনের মতো করে বেনারসি শাড়ি এবং কব্জিভরা চুড়ি দিয়ে সাজাবো। কিন্তু তা আর মনে হয় কখনো হবে না। বিয়ের পর যখন সব জানাজানি হলো তখনি সবার আগ্রহ ও কৌতূহল অতিমাত্রায় বেড়ে গেল। দুর্মুখোরা নানান রটনা রটাতে লাগলো। কিছুতেই যখন কিছু হলো না তখন ইসু হয়ে দাড়ালো বিয়ের শাড়ি।

যে শাড়ি পরেছে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি না থাকলেও অতি উৎসাহী ও লোভীজনেরা শাড়ির দর আর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করলো।

আমি পুরুষ মানুষ, আমার শাড়ি কেনায় ভুল হতে পারে ভেবে আমার শাশুড়ি ও বৌকে নিয়েই যে শাড়ি কিনেছি সেই শাড়ির জন্য আমাকে এতো অপমান সয়ে নেয়ার আগে মরে যাওয়া উচিত ছিল। যদিও আমরা একে অপরকে পেয়েই খুশি হয়েছিলাম।

সব কিছুর উর্ধে ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছি, সুন্দর একটা সংসারে সুখের ভেলা ভাসিয়ে নেয়ার চেষ্টায় আছি। একটা মাত্র শাড়ির অসিলায় সেই ভেলা হয়তো ডুবে যাবে অতলে।

সেই শাড়ির ইসু নিয়ে আমাকে এবং আমার বৌকে শ্বশুড়বাড়ির লোকজন ঘর থেকে পর্যন্ত বের করে দিয়েছে। ধৈর্যের বাধ এখনো ভাঙেনি। যখন ভাঙবে তখন যে কি করবো তা কল্পনারও অতীত। এক ইসু, এক কথা বার বার শুনতে শুনতে একেকবার ভাবি, সেই শাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই। কিন্তু আমি যে তাকে সেই শাড়িতে, সেই অপরূপ রূপে হাজারবার দেখতে চাই।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিয়ে

– তাছলিমা সিদ্দিকা

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা। আমাকে কনের সাজে সাজানো হচ্ছে। শুধু বিয়ের শাড়িটা তখনো পরানো হয়নি। এমন সময় বরপক্ষের দুই তিনজন মিলে বিয়ের সুটকেস নিয়ে ভেতরে এলো। আমার ছোটখালা লিস্ট দেখে সুটকেসের জিনিসপত্র বুঝে নিলেন।

শাড়ির প্যাকেটগুলো খুলে দেখেই আমার খালা–ফুপুরা ভ্রূ কুচকে ফেললেন। শাড়িগুলো এতোটাই অপছন্দ হয়েছিল যে, তাদের মনের ক্ষোভ তারা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারলেন না।

শাড়িগুলো কোথা থেকে কেনা হয়েছে, কে কিনেছে এবং বিয়ের শাড়িটার দামই বা কতো ইত্যাদি নানান রকম আক্রমণাত্মক প্রশ্নে বরপক্ষকে জর্জরিত করলেন।

আমাদের সমাজে বিয়ের আসরে বরযাত্রীরা সব সময়ই নিজেদেরকে কনেপক্ষের চেয়ে বড় মনে করে থাকে। ফলে তারা এই অপমানের তিনগুণ জবাব দিতে থাকলো। তুমুল হই চই, গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল।

পরে জেনেছিলাম, আমার বাবা এবং আমার শাশুড়ি মিলে উভয় পক্ষকে ম্যানেজ করেছিলেন। ওনাদের কারণেই হই চইটা আর মারামারির পর্যায়ে যায়নি।

এ রকম গুমোট আবহাওয়ার মাঝেই বিয়ে পড়ানো হলো। কবুল পড়ার সময় সূক্ষ্ম একটা কষ্ট বোধ হলো। মনে হলো মাত্র তিনটি শব্দের মাঝে বাধা পড়ে গেলাম। আজ থেকে আর কোনোদিন কাউকে বলতে পারবো না যে, আমি অবিবাহিতা, আমি স্বাধীন!

আমাকে বিয়ের শাড়ি পরানো হচ্ছে। এমন সময় আমার শাশুড়ি ঘরে ঢুকলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মা, তুমি কিছু মনে করো না। মাত্র একদিনের আয়োজনে বিয়ে হচ্ছে। তাই অনেক ভুলত্রুটি হতে পারে। তাছাড়া বিয়ের বাজার করারও কেউ ছিল না।

মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিতে দিতে গণ্ডগোলের কারণে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি এসেছিলাম। বাড়িতে আসার পর হুট করে মাত্র এক দিনের সময় নিয়ে আমাকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে মনটা খুব খারাপ লাগছিল।

যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হলো তার সঙ্গে আমার একেবারেই চেনাজানা নেই। শুধু একবার তাকে দেখেছি মাত্র।

আমার মতো বয়সে যে মেয়েরা বিয়ে করে, বিয়ের কনে সাজে তারা দুই চোখে স্বপ্নের জাল বোনার চেয়ে দুশ্চিন্তার বেড়াজালে বেশি করে আটকে যায়।

মনের এ অবস্থায় শাড়ি নিয়ে দুইপক্ষের হই চই মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু আমার শাশুড়ির কথা বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা শুনে আমার মনটা অনেকখানি ভালো হয়ে গেল।

এতোদিন পরেও একটা কথা মনে হলে হাসি পায়। সেটা হচ্ছে, বাসররাতে আমাকে বলা তার প্রথম কথা ছিল, শাড়ি পছন্দ হয়নি বলে কি তোমার মন খারাপ?

বিয়েতে সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেয়ার সাধ অপূর্ণ থাকায় এখন সে অকৃপণ হাতে আমাকে শাড়ি উপহার দেয়।

পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা থেকে

বিশ্বাসঘাতক

– নাসিমা জাহান নীরু

সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের মধ্যে একজন। দীর্ঘ সাত বছর তার সঙ্গে রাজশাহী কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে ব্যবস্থাপনা বিভাগে একই সঙ্গে পড়েছি। তার ডাক নাম ও আমার ডাক নাম প্রায় একই রকম এবং মনের মিল একই রকম হওয়াতে বন্ধুত্বটা গাঢ় ছিল। তার নাম তরুণ এবং আমার নাম নীরু।

দিনটি ছিল ১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর। তখন তরু আর আমি ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায়। সেদিন তরু আমার শ্বশুরবাড়িতে এসে বললো, আগামীকাল ষোল ডিসেম্বরে একটা অনুষ্ঠান আছে, তোর একটা হলুদ রঙের শাড়ি দে।

ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হওয়ার জন্য তরু জানতো যে, আমার সেই রঙের শাড়ি আছে। মনটা খচখচ করলেও সেটা তাকে দিলাম। শাড়িটা আমার প্রথম বিয়েবার্ষিকীতে দেয়া আমার স্বামীর প্রথম শাড়ি। কিন্তু তরুকে তো না বলা যায় না। শাড়িটা দেয়ার সময় বার বার করে বলেছিলাম যেন না ছিড়ে বা কোনো প্রকার দাগ না লাগায়। কারণ সে খুব উচু হিল পরতো। তরু বললো, সতেরো তারিখেই দিয়ে যাবো।

শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা পেটিকোট, ব্লাউজ এবং সুতার একসেট গহনা দিলাম সরল বিশ্বাসে। তারপরের ঘটনাটা ভীষণ খারাপ লাগার। যে বান্ধবী রাজশাহী এলেই আমার বাসায় একবার হলেও দেখা করতো সেদিনের শাড়ি নিয়ে যাবার পর থেকে প্রায় আড়াই বছর হতে চললো, শাড়িটা ফেরত দেয়া তো দূরের কথা, একবার দেখা পর্যন্তও করলো না। দুইবার তার ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি। তার কোনো উত্তর পর্যন্ত সে দেয়নি।

সে যদি শাড়িটা হারিয়ে, ছিড়ে বা কোনো প্রকারে নষ্টও করে দিয়ে থাকে, আমাকে একবার বলতে পারতো তার অপারগতার কথা। যখনই আমার স্বামী শাড়িটার কথা বলে, নিজেকে এতোই ছোট লাগে! জীবনের প্রথম পাওয়া প্রিয়জনের কাছে থেকে। সেই শাড়িটা আমি রাখতে পারিনি এক বিশ্বাসঘাতক বান্ধবীর জন্য।

রানীনগর, তালাইমারি, রাজশাহী থেকে

ভ্রম

– এস.আর বাবু

আজ থেকে ষোল বছর আগের কথা। মাত্র বিয়ে করেছি। বৌ এইচএসসি পাস করেছে। এবং ভাইবোনের মাঝে তার অবস্থান চতুর্থ। বোনের মাঝে দ্বিতীয়। বড় বোন বিবাহিতা এবং স্বামীর কর্মস্থল ঢাকা শহরে। বড় ফ্ল্যাট বাসায় বসবাস করেন। আমার স্ত্রীর ছোট দুই বোন কলেজে অধ্যয়নরত। তবে প্রসঙ্গ এখানে নয়, প্রসঙ্গ হলো বৌয়ের বড় বোন অর্থাৎ বড় শ্যালিকাকে নিয়ে।

বড় শ্যালিকাকে আঞ্চলিক ভাষায় জেঠাস অথবা আপা বলে ডাকার প্রচলন। তাকে আপা বলেই ডাকি। আপাটি বেশ সুন্দরী। তবে আমার স্ত্রীর চেয়ে বেশি নয়, মধ্যম মানের স্বাস্থ্য, হাসি–খুশি এবং উচ্ছলা নারী। সম্পর্কে বড় হলেও বয়সে আমার এক বছরের ছোট। আমার কর্মস্থলও ঢাকায় হওয়ায় বিয়ের পর পরই নিজ বাসায় যাওয়ার আগে ভায়রা এবং আপার একান্ত অনুরোধে তাদের বাসায় দুই মাসের মতো অবস্থান করেছিলাম।

নববিবাহিতা স্ত্রীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতায় এতোই দুর্বল ছিলাম যে, অফিস সময় ব্যতীত তাকে ছাড়া দূরে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর পরই স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা, তার ওই দুটোতে চাপ দেয়া ইত্যাদি দৈনিক ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। এসব প্রায়ই আপা দেখে ফেলতেন। তাই এসব নিয়ে আপা এবং ভায়রাভাই বেশ রসিকতা করতেন।

একদিন বিকাল পাচটায় অফিস থেকে বাসায় আসি। স্ত্রীকে বেডরুম তিনটির কোনোটিতেই না পেয়ে সোজা কিচেনে চলে যাই। গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী রান্না ঘরে কাজে ব্যস্ত। তার পেছন দিক দেখতে পাচ্ছি। আর যায় কোথায়? পেছন থেকেই জড়িয়ে ধরে বুকে দিই আনন্দদায়ক চাপ। সে মাথা ঘোরালো। কিন্তু একি! এযে আমার বৌয়ের বড় বোন অর্থাৎ আপা। সর্বনাশ! সরি বলে দিলাম ভেতরের বেডরুমের দিকে দৌড়। আসলে ব্যাপারটা ছিল, শাড়ি ভ্রম। ওইদিন আমার জেঠাস অর্থাৎ আপা শখ করে আমার বৌয়ের একটি শাড়ি পরেছিলেন। ফলে পেছন থেকে দেখতে আমার স্ত্রীই মনে হয়েছে। ওই সময় আমার স্ত্রী গিয়েছিল বাসার ছাদে বৈকালীন দৃশ্য দেখতে।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে আবার আপার কাছে গিয়ে বললাম যে, আসলে ভুলটা হয়েছে শাড়ির দোষে।

আপাও বললেন যে, আপনার কোনো দোষ নেই। আমারই সম্পূর্ণ দোষ। কারণ এভাবে ছোট বোনের শাড়ি পরার শখ করাটা উচিত হয়নি।

যাক, ঘটনাটি আমি এবং আপার মধ্যে থাকলো। এর বেশি আমিও আর অগ্রসর হইনি। তবে এখনো মাঝে মধ্যে মজা করে উক্তি করে বসি যে, আপাকে লতার মতো অর্থাৎ আমার স্ত্রীর মতো দেখাচ্ছে। আপা লজ্জায় লাল হয়ে মুচকি হাসে। উপস্থিত অন্যরাও হাসে। তবে জানে না এই কথার সারমর্ম কোথায়। যা জানি কেবল আমি এবং আমার জেঠাস অর্থাৎ আপা।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মালিবাগ, ঢাকা থেকে

সারপ্রাইজ

– বেলাল

তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজে পড়ি। প্রেম করতাম পাশের গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে। সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। ছুটিতে বাড়ি এলে আমার বেশির ভাগ সময় কাটতো আমার প্রেমিকা উর্মির সঙ্গে তাদের বাড়িতে। উর্মির বড় বোনদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

ভাইয়েরা সব চাকরি সূত্রে ঢাকায় সেটেলড। পড়া দেখিয়ে দেয়ার ছুতোয় দিনের বেশির ভাগ সময় উর্মির সঙ্গে তার ঘরে কাটাতাম। আমার আসতে সামান্য দেরি হলে রাস্তা দিয়ে যেই আসতো তাকে দিয়েই খবর পাঠাতে থাকতো।

আমাদের প্রেমটা ছিল খুব গোপন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উর্মির ঘরে বসে থাকলেও আমাকে কেউ সন্দেহ করতো না।

একদিন দুপুরের আগে তার কাছে থেকে এসেছি। আমার সময় সে বলে দিয়েছে, বিকেলে এসো, একটা সারপ্রাইজ আছে।

বিকেলের দিকে কি এক কাজে ভুলেই গেলাম তার কথা। সন্ধ্যায় সে খবর দিয়েছে।

গিয়ে দেখলাম, ঘর অন্ধকার করে সে বসে আছে। আমার শব্দ শুনে গাল ফুলিয়ে কাদছে। সরি বলে, জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করলাম।

উর্মি বুকের কাছে সেটে এসে আমাকে জড়িয়ে কাদতেই থাকলো। চুমোয় চুমোয় তার অধর ভরিয়ে দিতে থাকলাম। কান্না কিছুটা ধরে আসার পর বুঝতে পারলাম উর্মি শাড়ি পরেছে। সেই বিকেল থেকে শাড়ি পরে বসে আছে। এটাই তার সারপ্রাইজ। আমার জন্য শাড়ি পরেছে। আমাকে সবার আগে দেখাবে বলে ঘর থেকে বেরই হয়নি।

মুহূর্তের জন্য নিজেকে বড় পাষণ্ড মনে হলো। তার বাবা মা সেদিন তার বোনের বাড়ি গিয়েছিলেন। বাড়ি পুরো খালি শুধু কাজের মেয়েটা ছাড়া। আমাদের ব্যাপারটা সে জানতো। দেশলাই জ্বালিয়ে উর্মির শাড়ি পরা অবয়বটা দেখলাম। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে যেন স্বর্গের অপ্সরা।

আমার উন্মাদনা গেল বেড়ে। অবাধ্য হাত তার ব্লাউজ–ব্রা খুলে ফেলতে লাগলো। বাধ ভাঙা প্রেমের জোয়ারে হারিয়ে যেতে থাকলাম আমরা দুজন।

এক সময় ঝড় থেমে গেল। দুটি অসার দেহ পরস্পরকে জড়াজড়ি করে পড়ে রইলাম।

সে তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, কখনো ছেড়ে যেও না, কখনো ভুলে যেও না।

তাকে বুকের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরলাম। শাড়িটা এক পাশে এলোমেলোভাবে পরেছিল।

কলেজ পেরিয়েছি সেই কবে। ইউনিভার্সিটির গণ্ডিটাও পার হবো হবো করছি। যমুনায় অনেক জল গড়িয়েছে। আমার প্রিয়া আমাকে ফেলে চলে গিয়েছে অনেক দূরে।

তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে অন্যত্র। আমার জন্য সে আর শাড়ি পরে পথ চেয়ে বসে থাকে না। ঠোট ফুলিয়ে আর কাদে না আমার বুকে মাথা রেখে। কানের কাছে ফিশ ফিশ করে না। হয়তো সে আমাকে ভুলে গেছে। হয়তো ভোলেনি। তবে তাকে ভুলতে পারিনি আজো, পারবো না কখনো। বুকের ভেতর এক শূন্যতাকে লালন করে বেচে আছি। আমি বড় একা।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ছিনতাইকারী

– শামসুল হক হাওলাদার

বিক্রমপুর কে.বি ডিগ্রি কলেজে চাকরি হওয়ার পরই বিয়ে করার ইচ্ছা জাগে মনে। এমন সময় আমাদের গ্রামে লুনা নামে এক মেয়ে বেড়াতে আসে। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। ঢাকায় পড়াশোনা করে। কিছুদিন পর ঘটকের মাধ্যমে লুনার সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা হয়। এরপর একদিন বিয়েটা আরো পোক্ত করার জন্য লুনার খালাম্মা আমাদের কাবিন করে ফেললেন। আমার বাবার আপত্তি সত্ত্বেও কাবিন করলাম। তবে লুনার আম্মাকে বাবা বললেন যে, কাবিন হলো ঠিকই বিয়াইন কিন্তু পোলা–মাইয়া যেন বিয়ার আগে দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারে। তাতে বিয়ার আসল মজা থাকে না। শর্ত শুনে দমে গেলাম। পরে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢাকায় লুনার সঙ্গে দেখা করতাম।

তাকে উঠিয়ে আনতে আরো দুই মাস বাকি। একদিন তাকে নিয়ে ইস্টার্ন প্লাজায় ঘুরতে গিয়ে তার জন্য একটি ভারতীয় শাড়ি কিনলাম। কিন্তু লুনা তখন শাড়িটি নিল না। আমাকে বললো, শাড়িটা বাড়ি নিয়ে যাও। তোমার মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

ভাবলাম প্রস্তাবটা মন্দ নয়। শাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল। কুচিয়ামোড়া ফেরিঘাটে এসে দেখি ফেরি বন্ধ। তখনো ধলেশ্বরী বৃজ হয়নি। নৌকা দিয়ে নদী পার হয়ে অপর পারে আসার সময় চরকুন্দলিয়া স্কুল বরাবর আসতেই হঠাৎ দুজন ছিনতাইকারী এসে বললো, কি আছে দে।

হাতে ছিল বৌ–এর জন্য কোনো প্রথম শাড়ি। টাকা তেমন কিছু নেই। ছিনতাইকারীরা আমাকে দুই দিক থেকে এসে গলাটিপে ধরলো এবং আমার হাতের শাড়ির ব্যাগটা টেনে নিতে চাইলো। কোনো কিছু না বুঝেই বাংলা ছবির নায়কের মতো দুজনকে কনুই মেরে দুই দিকে ফেলে দিয়ে মারলাম সামনের দিকে দৌড়। ছিনতাইকারীরা উঠে আসতে আসতেই আমি সামনের দোকানের কাছে পৌছে গেছি। ততোক্ষণে কয়েকজন লোক এসে পড়ায় ছিনতাইকারীরা পেছন দিকে চলে যায়। আমার কেনা বৌকে দেয়া প্রথম শাড়িটা রক্ষা পায়।

কুসুমপুর, সিরাজদিখান থেকে

সেইফটি ফার্স্ট

– সাইমুম

শাড়ি, বঙ্গ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারী তার পূর্ণ রূপে উদ্ভাসিত হয় এ পরিধেয়টি পরিধানের মধ্য দিয়ে। তাই তো যুগ যুগ ধরে মহেন্দ্রক্ষণগুলো উদযাপন করে নারী এ বস্ত্র পরিধানের মধ্য দিয়ে। বর্ষবরণ, বসন্ত, গায়েহলুদ, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোতে এর বিকল্প পরিধেয়–র কথা কেউ কখনো ভাবেনি।

সেলাইবিহীন এ দীর্ঘ বস্ত্রটি পরিধানও এক চমৎকার কৌশল। একটা আর্ট। পরিহিতা অবশ্যই এর কৃতিত্বের দাবিদার। এ কারণে অনেক বিদেশিকেও আকৃষ্ট হতে দেখা যায়।

তবে আমাদের মা-বোনেরা এখন আর চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নেই। ঘরের কাজের পাশাপাশি তারা সমান তালে এগিয়ে চলছে পুরুষের কাধে কাধ মিলিয়ে। তাই শাড়ি সার্বক্ষণিক পরিধেয় রূপে কতোটা যৌক্তিক তা ভেবে দেখার মতো।

এক. এক সন্ধ্যায় মা আমাকে বললেন, আজ তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। অতঃপর পুড়ে যাওয়া শাড়ির আচলটি আমায় দেখালেন। আমি সৌভাগ্যবান যে মা বিপদ ঘটার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমার সহকর্মীর মায়ের বেলায় তেমনটি ঘটেনি। ছুটি শেষে নির্দিষ্ট দিনে কর্মস্থলে যোগ না দেয়ায় ফোন করে জানতে পারি তিনি তখন ঢাকা মেডিকালের বার্ন ইউনিটে। ওই দিন তার জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তার শাড়িতে আগুন ধরে যায়। দগ্ধ হন মারাত্মকভাবে। তিন দিন সেখানে যুদ্ধ করে তিনি মারা যান।

দুই. আমার বান্ধবী শাড়ি পরে সামনে এলে দুষ্টুমি করে বলেছিলাম, কি ব্যাপার! তোমার পেট ও পিঠ আমাকে দেখাচ্ছো কেন? বিয়ের কাতানে আরো খুকি লাগছিল। কারণ সেই ভারী জিনিসটা দুই পাশে দুই হাতে ধরে সে হাটছিল। এখনো শাড়ি পরলে তাকে মনে হয় কখন যেন পা আটকে পড়ে যায়।

তিন. আমার কর্মজীবী বোন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। বিআরটিস বাস থেকে নামার সময় শাড়ির আচল আটকে গিয়েছিল দরজার কোনো লোহায়। রিকশায় উঠলেও চাকায় আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে অসাবধানতার সুযোগে।

চার. গ্রামের আমার এক পরিচিতা মহিলা নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছেন। সাতার জানা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় তা কাজে লাগাতে পারেননি সম্ভবত এ দীর্ঘ জিনিসটি পায়ে পেচিয়ে যাবার কারণে।

পাচ. আমার এক সহপাঠিনী রাস্তা পার হওয়ার সময় আহত হয়েছেন। কারণ দুই পাশে দেখে নিলেও যতোটা দ্রুততায় হাটা উচিত ছিল তা তিনি পারেননি শাড়ি পরে থাকার কারণে।

সুতরাং শাড়িতে তার মোহময়ী রূপে নারী আবির্ভূত হলেও পরিধেয়টি সব সময় তার জন্য নিরাপদ নয়। সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে মনে করি, কেবল বিশেষ অকেশনে এটা পরিধান করা উচিত। আফটার অল সেইফটি ফার্স্ট।

খিলগাও, ঢাকা থেকে

দেরাজে বন্দী

– সাঞ্জু

বিশাল প্রান্তর। যতোদূর চোখ যায় শুধু ফসলের মাঠ আর মাঠ। মাঝে বিশাল বট গাছ। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটি গ্রামীণ বধূ আসছে। গন্তব্য বটতলা। বধূটি এখন অনেক কাছে। তার পরনে সেই শাড়িটি যা প্রতিদিন আসার পথে দোকানে দেখে আসছি, যা কেনা আমার সাধ্যের বাইরে, যা শুধু কল্পনাতে পরেই মন জুড়াতে হয়। অসাধারণ এ শাড়িতে বধূটিকে অসাধারণ লাগবে তাতে আর সন্দেহ কি? সেই সঙ্গে যদি হয় গোছা ভরা চুড়ি, নাকে নথ, আলতা রাঙা পায়ে রূপার নূপুর। তবে কি আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে?

বধূটি গাছতলায় পৌছে গেল। তার শাড়ির আচলের নিচ থেকে খাবারের পুটলিটা বের করে নিচে রাখলো। তারপর তাকিয়ে রইলো মাঠের দিকে। একটু পর মাঠের দিক থেকে দৌড়ে এলো এক সুঠাম দেহের কালো যুবক। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত শরীরে বৌয়ের কাছে পৌছাতেই বৌটি ছোট ঘড়া থেকে পরম ভালোবাসায় পানি ঢেলে দিল। যুবকটি হাত–মুখ ধুয়ে নিল। তারপর হঠাৎ করেই সে বৌয়ের আচল ধরে টান দিল। খসে পড়লো তার ঘোমটা। চোখে–মুখে দুষ্টুমির হাসি নিয়ে সে দখল নিল বৌয়ের আচল। তারপর তা দিয়েই হাত–মুখ, গলা–ঘাড় মুছতে লাগলো, বৌয়ের মুখেও হাসি। তবে তা তৃপ্তির চোখে মমতার প্রশ্রয়।

একটু পর চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ তুলে বরের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিল লক্ষ্মী বৌটি যেন ছোট একটি শিশুকে খাওয়াচ্ছে। বরটিও মাঝে মধ্যে খাবার তুলে দিচ্ছিল বৌয়ের মুখে। ছোট ছোট কথা হচ্ছিল, হাসছিল দুজনেই। খাওয়া শেষ হলো। নিবিড় স্নেহে বৌটি আচল দিয়ে মুছিয়ে দিল বরের মুখ। তাপর সে আচলই পেতে দিল জমিতে। বৌয়ের কোলে মাথা রেখে সে আচলে শুয়ে পড়লো বরটি। এরপর বাদ পড়লো না কিছুই। একটু ভালোবাসা, একটু রাগ, সুখ আর সুখ। কিন্তু হঠাৎ এক ধাক্কায় বরকে কোল থেকে সরিয়ে আচলখানা টান দিয়ে, খিল খিল হাসি ছড়িয়ে বৌটি ছুট লাগালো বিশাল প্রান্তরে। পেছনে বরটিও। বাতাসে বৌয়ের আচল উড়ছে। কিছু দূর যেতে সে আচলই দখল নিল বরটি। হেচকা টানে বৌটি তার একদম পাজরের মধ্যে। শক্ত দুটি বাহুতে আবদ্ধ হয়ে বৌটি চোখ বুজলো আবেশে। ঠোটে বিরামহীন হাসি। হাপাচ্ছে দুজনেই। বাহুতে চাপ সৃষ্টি করে বরটি মুখটাকে বৌয়ের কানের কাছে এনে জড়ানো কণ্ঠে বললো, ভাগছিলে কেন?

উহ, লাগছে!

লাগুক। বলে বৌটিকে আরো জোরে আকড়ে ধরলো বরটি। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলো, কই, বললে না তো ভাগছিলে কেন?

বৌটি ঠোট উল্টিয়ে আদুরে গলায় বললো, এমনি, ইচ্ছা হলো তাই। দেখি, এখন ছাড়ো তো।

শিথিল বাহু থেকে মুক্ত হলো আদুরি বৌ। বরের দিকে তাকালো। বরটি ঘামছে দড় দড় করে। গরমে কালো মুখ আরো কালো দেখাচ্ছে। বৌয়ের আচল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সে বসে পড়লো মাঠে। হাপাচ্ছে তখনো।

ওহ, কি গরম রে বাবা!

বৌটি আস্তে আস্তে তার পেছনে এসে দাড়ালো। তারপর তার আচলখানা মেলে ধরে আড়াল করলো বরকে সূর্যের হাত থেকে। বরকে বাচাতে গিয়ে নিজের পিঠখানা পুড়িয়ে ফেলছে রোদে, অথচ মুখে কোনো বিকার নেই। সেখানে শুধু প্রশান্তির হাসি।

কিন্তু হঠাৎই যেন প্রকৃতিতে বদল এলো। চারদিকে যেন কিসের অশনিসঙ্কেত। বাতাসে ফিসফাস শব্দ। রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে প্রকৃতির রঙ যেন কেউ আসছে। হা আসছে। আসছেই তো, ওই যে দেখা যাচ্ছে। একটি রূপসী নারী, পরনে বাহারি রঙের শাড়ি। খোলা চুল, নেশা ধরানো হাসি, উগ্র চাহনি, হেটে যাচ্ছে তাদেরই সামনে দিয়ে। পেছনে ফিরে চাইলো সে। তার চোখে এ কিসের আমন্ত্রণ? সে হাটছে। ওমা, একি! বরটি এ মন্ত্রমুগ্ধের মতো কোথায় চললো! বৌটি থামাতে চাইলো। পারলো না। সে চলে যাচ্ছে, মন্ত্র চালিতের মতো সেই রূপসী নারীর পিছে। বৌটিও পেছনে ছুটলো।

কিন্তু নাগাল পেল না। তারা অনেক দূরে চলে গেছে। বৌটি চিৎকার করে ডাকলো যা আর্তনাদের মতো শোনালো। সে আর্তনাদ বাতাসে অদ্ভুত শব্দ করে গেল। সামনে রাখা আচলের ওপর শূন্য দৃষ্টিটা এবার ঝাপসা হয়ে এলো। টপ টপ করে অশ্রু পড়ে তা ভিজিয়ে দিল। ধপ করে মাটিতে বসে পড়লো বৌটি। অসহায়ের মতো আচলে মুখ ঢাকলো। তার কষ্টগুলো তখন পাকিয়ে পাকিয়ে বাতাসে ঘূর্ণি তৈরি করছে। করুণ কান্নার আওয়াজে প্রকৃতির নিস্তব্ধ। দম বন্ধ করা এক পরিবেশ। কষ্ট, বড় কষ্ট!

কষ্টে ঘুমটা ছুটে গেল। বুঝলাম স্বপ্ন দেখছিলাম। বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে গেছি। একটু হাপাচ্ছিও। গলার কাছে শক্ত কি যেন একটা আটকে আছে। পানি খাবার জন্যই উঠলাম। আলো জ্বালতেই চোখ গেল বিছানার শূন্য বালিশটার দিকে। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। গলার কাছের শক্ত জিনিসটা যে আমার দমিয়ে রাখা কান্না তা আর বুঝতে বাকি রইলো না। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম দেরাজের দিকে। বের করে আনলাম সযত্নে তুলে রাখা সেই শাড়িটি যে শাড়িটি ঘিরে ছিল আমার অজস্র স্বপ্ন। তিল তিল করে জমানো টাকা দিয়ে যেদিন শাড়িটি কিনে আনি এবং আমার স্বপ্নকে বাস্তবে দেয়ার অপেক্ষায় বিভোর হই সেদিনই জানতে পারি তাদের সম্পর্কের কথা। তারপর আর এ শাড়ি পরা হয়নি। হয়নি এ শাড়ির আচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেয়া কিংবা প্রখর রোদের হাত থেকে তাকে আড়াল করা হয়নি তার শোবার জায়গায় তা বিছিয়ে দেয়া। হয়তো আর কখনো তা হবেও না। কারণ এরা যে পুরুষ!

শাড়ির আচলের ভালোবাসা এরা বোঝে না। এরা জানে না শাড়ির আচলের বিশালতা। এরা শুধু জানে শাড়ির অন্তরালে ঢেকে থাকা শরীরটাকে উপভোগ করতে। তাই এ উপভোগ্য শরীরের সন্ধানে এরা ছোটে দিক থেকে দিকে। আর আমার স্বপ্নগুলো স্বপ্ন হয়েই থেকে যায় এই শাড়ির মতো দেরাজে বন্দী হয়ে।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

শ্বশুর

– লিমন

পাত্রপক্ষ খুবই বড়লোক। প্রচুর ধানের জমি, বড় দীঘি, এছাড়া ফলের বাগান। এসব শুনে আমার অভিভাবক রাজি হয়ে গেলেন বিয়ে দিতে।

সেটা ১৯৭৬ সালের কথা। সবেমাত্র এইচএসসি পাস করে বিএ–তে ভর্তি হয়েছি। পাত্র বিএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে, তখনো রেজাল্ট হয়নি।

পাত্র ছিল গ্রামের। অবশ্য আমরাও গ্রামের। তবে আব্বার চাকরির সুবাদে ছোটবেলা থেকেই ঢাকায় থাকি। আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে পাত্রের বাড়ি প্রায় পাচ কিলোমিটার দূরে।

বিয়ের তারিখ ঠিক হলো। এরই মধ্যে একদিন পাত্রপক্ষের দুজন মুরুব্বি শ্রেণীর লোক এলেন আমাদের বাসায়। তারা বিয়ের শপিংয়ে এসেছেন। যেহেতু আমরা শহরে থাকি তাই আমাদের পছন্দ মত শপিং করবে। আব্বা তখন বাসায় ছিলেন না। তাই দাদাকে (বড় ভাইয়া) নিয়ে গেলেন শপিংয়ে।

দাদা তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তার ধারণা ছিল, যেহেতু পাত্ররা বড়লোক তাই দামি জিনিসপত্রই কিনবে। দাদা ওদের নিয়ে গেলেন নিউ মার্কেটে। বারোশ টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন কাতান শাড়ি। পাত্রপক্ষের যারা শপিংয়ে এসেছিলেন তাদের তো এক শাড়ি কিনেই সব টাকা শেষ। ওদের ধারণা ছিল, দুই তিনশ টাকার মধ্যে শাড়ি কিনে বাকি টাকায় অন্য জিনিসপত্র কিনবেন। কিন্তু টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় আর কিছু না কিনেই বাড়ি চলে গেলেন।

পরবর্তী কালে স্থানীয় বাজার থেকে অন্যান্য জিনিসপত্র ও কসমেটিস কিনলেন। এগুলো এতোই কমদামি ছিল যে, বিয়ের দিন আমাদের বাড়ির অনেকেই এসব নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন।

তাছাড়া বিয়ের শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে পেটিকোট, ব্লাউজ কেনা হয়নি। তখনকার দিনে কাতান শাড়ির সঙ্গে জর্জেটের ব্লাউজ ম্যাচ করে পরানোর নিয়ম ছিল।

যাই হোক। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দেখা দিল শাড়ি নিয়ে আসল সমস্যা। যৌথ পরিবারে বাড়ির প্রথম বৌ প্রশ্ন তুললো তার বিয়ের শাড়ি নিয়ে। ওই শাড়ি ছিল দেড়শ টাকা দামের।

আমার বিয়ের কিছুদিন পর আমার শ্বশুর গেলেন তার বেয়াইবাড়ি (প্রথম বৌয়ের বাপের বাড়ি)। সেখানে বেয়াইসহ বাড়ির অন্যরা মিলে আমার শ্বশুরকে ধরলো বিয়ের শাড়ি নিয়ে। তাদের দাবি, তাদের মেয়েকেও একই দামের শাড়ি কিনে দিতে হবে। আমার শ্বশুর রাজি না হওয়ায় তাকে তাদের বাড়িতে আটকে রাখা হলো বন্দীর মতো। তখন ঢাকা থেকে একই দামের শাড়ি কিনে এনে আমার শ্বশুরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হলো বন্দীদশা থেকে।

এ ঘটনার পর আর কোনোদিন আমার বিয়ের শাড়ি পরিনি। যদিও এ শাড়ির মর্যাদা প্রতিটি নারীর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘটনাটি আমার মায়ের জীবনে ঘটেছিল এবং মায়ের কাছ থেকে শুনে তার জবানিতেই লেখা।)

বড়নল, শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে

পোড়াকপালি

– খালেদা পারভীন মুন্নী

প্রথম যেদিন শাড়ি পরি সেদিনটি আজো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তখন সবে কলেজে উঠেছি। আমরা কয়জন বান্ধবী মিলে ঠিক করি আগামীকাল সবাই শাড়ি পরে কলেজে আসবো। পরের দিন যথানিয়মে শাড়ি পরতে গিয়ে প্রথমেই বিপত্তি। কোন দিক দিয়ে কোমরে গুজবো, বাম দিক, না ডান দিক। আচল কোন দিকে থাকবে, বাম কাধে, না ডান কাধে। কিছুই যখন করে উঠতে পারছি না তখন পাশের বাসার ভাবীর সহায়তায় সে যাত্রায় রক্ষা পেলাম। ওদিকে মা তখন রান্নাঘর থেকে তারস্বরে চেচাচ্ছিলেন। কি দরকার কলেজে শাড়ি পরে যাবার। শেষে শাড়ি পেচিয়ে না কোনো বিপদ হয়। আমি বলি, কিছু হবে না, তুমি দেখো, তাছাড়া সব বান্ধবীরা পরছে, আমি কেন পরবো না?

সেদিন আবার আমাদের কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল ক্লাস ছিল। আমরা সবাই লাইন বেধে যখন ক্লাস করছিলাম, আমার পেছনের মেয়েটির স্পিরিট ল্যাম্প থেকে আমার আচলে আগুন লেগে গেল। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কাজ করছিলাম। তাই টেরও পেলাম না। আর যে মেয়েটি হতবাক হয়ে

দেখছিল এবং কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। ওদিকে আগুন যখন বেড়ে গেল, অন্যদের দৃষ্টিতে এলো, তখন সবাই *আগুন আগুন* বলে চেচাচ্ছিল। আমি কিছু না বুঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কিন্তু কোথাও আগুন দেখতে পাচ্ছি না। ততোক্ষণে খেয়াল হলো সবাই আঙুল দিয়ে আমার পেছন দিকটা দেখাচ্ছিল। তখনি আমার শরীরে আগুনের স্পর্শ পাই। ভয়ে শাড়ির ঊর্ধাংশ খুলে সমানে চেচাচ্ছি।

কিছু দুষ্টু ছেলে তখন আমাকে দেখে খুব মজা পাচ্ছিল। কিন্তু আমার সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। আগুন থেকে কিভাবে রক্ষা পাবো তখন এটাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। আমার এক বান্ধবী পরামর্শ দিল, শাড়ি পুরোটা খুলে ফেল, পেটিকোট তো আছেই। তখন কাদছি আর আচল ঝাপটাচ্ছি তাতে। আগুন আরো বেড়ে যাচ্ছিল।

আল্লাহ সহায়। ঠিক তখনি কে যেন কলেজের বাইরের পুকুর থেকে এক বালতি পানি এনে আমার পেছনটায় ঢেলে দিল। আগুন নিভে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় তখন হতবাক, স্যারের বকা, অন্যদের হাসাহাসি কিছুই কানে ঢুকছিল না।

বিকেলে আলুথালু বেশে যখন ঘরে ফিরি তখন মাও এক চোট বকে দিলেন। বলেছিলাম না, তুই একটা বিপদ ডেকে আনবি। এবার দেখলি তো আমার কথা না শুনলে এমনি হবে। এরপর থেকে মায়ের অবাধ্য আর কখনো হইনি।

পরে অবশ্য কলেজে এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছে। তখন আমি কেমন করেছিলাম, বন্ধুরা অভিনয় করে দেখাতে লাগলো। এবং আমিও স্যারের চোখে পড়ে গেলাম, যেদিন প্র্যাটিকাল ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতাম স্যার সেদিন বলতেন, কই, আমার পোড়াকপালি মেয়েটা কই, তাকে তো দেখছি না। এতে আমার লাভই হলো। কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকালে আমার অন্য কোনো বন্ধু পুরো নাম্বার না পেলেও আমি পুরো মার্কসই পেয়েছিলাম এবং শাড়ি পরা তো এখন মাত্র দুই মিনিটের ব্যাপার। এখন এ ধরনের কোনো সমস্যায়ই পড়তে হয় না।

লালখানবাজার, চট্টগ্রাম থেকে

সোনালি কাতান

– হাসান

কথায় কথায় মা বললেন, সামনের ছুটিতে আসার সময় মনে করে একটা লাল কাতান এনো। তোমার বিয়েতে কাজে লাগবে। বাইরের কাতানগুলো চায়না সিল্কের ওপর জড়োয়া কাজ করা। দেখতেও ভালো এবং কিছুটা হালকা। শরীরে জড়িয়ে থাকে। মেয়েরা পরেও স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

পরবর্তী ছুটিতে ঢাকা আসার সময় বেশ অনেকগুলো দোকান ঘুরে একটা কাতান কিনলাম। গাঢ় মেরুন জমিনের ওপর সোনালি জরির কাজ করা শাড়ি। চওড়া পাড় এবং জড়োয়া আচল। এক কথায় চমৎকার। সুন্দর বিয়ের শাড়ি। সবাই খুব পছন্দ করলো।

অনেক দিন শাড়িটা আলমারিতে পড়ে ছিল। এর মাঝে মা মারা গেলেন। মা দেখে যেতে পারেননি। আমার বিয়েতে সেই সোনালি মেরুন কাতান শাড়িটি দিয়েছিলাম বিয়ের শাড়ি হিসেবে। বিয়ের দুই দিন পর আমার নববধূ আমায় প্রশ্ন করেছিল, শাড়িটা তুমি কার জন্য কিনেছিলে? নিশ্চয় আমার জন্য

নয়? আমার গায়ের রঙের জন্য এই শাড়ি বেমানান। একটু হেসে বললো, তোমার কল্পনার বধূটি ছিল নিশ্চয় ধব ধবে ফর্শা। তাই না?

আমি হেসে বললাম, মেরুন আমার পছন্দের রঙ।

তারপর আমরা প্রবাসী। প্রবাস জীবনের অনেক কিছুর সঙ্গে আমার স্ত্রীর পোশাক–পরিচ্ছদও পাল্টে যেতে লাগলো। শাড়ি, সালোয়ার–কামিজ, শার্ট–প্যান্ট। একদিন সে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, তোমার কি খারাপ লাগে এই যে আমি প্যান্ট–শার্ট পরে ক্লাসে যাই?

কখনোই না। এখানের পোশাক–আশাকের সঙ্গে তোমাকে মানিয়ে চলতে হবে। তা না হলে মূলধারা থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তবে আমার আপত্তি আছে অশালীন পোশাকের ব্যাপারে।

প্রতিদিন ক্লসেট খুলে কাপড় বের করার সময় চোখে পড়ে সেই সোনালি কাতান। হ্যাংগারে ঝোলানো পলিথিনে মোড়ানো। শাড়িটি পরাই হয় না তার। তবে কোনো অনুষ্ঠান না থাকলেও বছরের বিশেষ একটি দিনে ও ঠিকই পরে সেই মেরুন সোনালি কাতানটি। আমাদের বিয়েবার্ষিকীতে। পরে এসে আচল টেনে আমার সামনে দাড়িয়ে বলে, কেমন লাগছে আমাকে বলো তো?

আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। বুকের গভীরে অনুভব করি, এক যুবকের ভালোবাসা আর স্বপ্ন জড়ানো এই শাড়ির সোনালি কাজের বুননে।

টরন্টো, কানাডা থেকে
hassanq@chrc.net

সংকেত

– নাহার

জীবনের প্রথম প্রেমে হোচট খেয়েছি। মনে হয়েছে প্রেম বলে কিছু নেই। অসম প্রেম কোনোদিন টেকে না। তারপর থেকে মনের মধ্যে পুরুষ বিদ্বেষী ভাব জমা হতে থাকে। প্রতিজ্ঞা করলাম, বিয়ে–টিয়ে আর কখনো করবো না। কিন্তু আমাদের যা সমাজ ব্যবস্থা তাতে ইচ্ছা থাকলেও মেয়েরা একা থাকতে পারে না। বিয়ে না করলে আপন কারো আশ্রয়ে থাকতে হবে। কারণ মা বাবা তো চিরদিন বাচে না। ভাই বোনের সংসারে? সে চিত্র আরো ভয়াবহ ভেবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলাম। বিয়ের পিড়িতে বসতে হলো। সবেমাত্র ইউনিভার্সিটির পাট চুকিয়ে চাকরিতে ঢুকেছি।

একদিন আমার অফিসে আমাকে সে দেখে। আমাকে তার ভালো লেগেছিল, নাকি লাগেনি আজো জানি না। কারণ একটা বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া তার আচরণে কোনোদিন ভালোলাগার আবেগ দেখি না। তবু সেদিন দেখার আট দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে ও আমাকে একটা লাল বেনারসি শাড়ি দিয়েছিল। শাড়িটা সুন্দর! কিন্তু আর দশটা মেয়ের মতো শাড়িটাকে বিয়ের স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারিনি। বিয়ের ছয় মাসের মধ্যে কোনো এক অনুষ্ঠানে পরতে নিয়ে দেখি শাড়িটা ভাজে ভাজে ক্ষয়ে গেছে।

কিছুতেই পরা গেল না। মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগলো। বিয়ের শাড়ি নষ্ট হলো? কুসংস্কার বলি আর যাই বলি, আমাদের সকলের মধ্যে কিছু না কিছু তো আছে। আজ বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে নানান অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করছি, শাড়ি ছেড়াটা নিছক কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এর মধ্যে অনেক

সংকেত লুকিয়ে ছিল। তাই অনেক ক্ষতের মধ্যে ওই শাড়ি ছেড়ার ক্ষতটাও হৃদয়ের মাঝে লাল দগদগে হয়ে আছে।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
ঢাকা থেকে

লজ্জা

– স্মৃতি

তার সঙ্গে সাইকেলে চড়ে ঘুরছিলাম। হঠাৎ হোচট খেয়ে পড়ে গিয়ে দেখলাম আমার শাড়িটা চাকায় প্যাচিয়েছে। তার পাঞ্জাবিটা আমাকে পরতে দিয়ে সে চাকা থেকে শাড়ি ছাড়ালো। ইশ, সে কি লজ্জা!

অম্বিকা হল, ফরিদপুর থেকে

জোড়ার শাড়ি

– আশরাফুল ইসলাম

সেজআপা বিএ পরীক্ষার্থী। তার সিট পড়েছে নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজে। আপা রুমে ঢুকে যাবার পর আমার সময় কাটে সেই সময়কার কলেজের ভিপি শামীম ওসমানের রুমে। সঙ্গী আমার এক আত্মীয়া। পরীক্ষার সময়ে আর বের হওয়ার সুযোগ থাকে না।

চতুর্থ পরীক্ষার পর আপাসহ বের হওয়া মাত্রই পেছন দিক থেকে ডাকছেন আমার প্রাইভেট টিউটর রতন স্যার। সঙ্গে এক টেকো কিন্তু সুদর্শন লোক। চারদিন ধরে তোমাদের খুজছি, পাচ্ছি না বলেই তিনি এক কনফেকশনারিতে ঢুকতে যাচ্ছেন। আপা যাবেন না।

স্যারের পীড়াপীড়িতে যেতে বাধ্য হলেন। সঙ্গের লোকটি পরীক্ষা কেমন হচ্ছে? এ জাতীয় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন আপাকে।

পরের দিন সকালে রতনস্যার বাসায় এসে হাজির। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, গতকাল তার সঙ্গে থাকা ছেলেটি শিপিং ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকা থেকে ছুটি কাটাতে এসেছে। এখন বিয়ে করবে। গতকাল দেখা আপাকে তাদের পছন্দ হয়েছে। এখন আমরা হ্যা বললেই এগোবে তারা।

ঝড়ের কবলে শিপ ডুবে ছেলে মরে যাবে এই বক্তব্যে ফ্যামিলির সবাই এ প্রস্তাব নাকচ করে দিল। ছেলে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এ ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান থাকলেও বয়স কম বলে আমার কথা টেকেনি।

বিএ পাস করার পর নানান দিক থেকে আপার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু হলো। কিন্তু কোথাও কথাবার্তা বেশি দূর এগোয়নি। এমনি করে ১৯৮৯ সালের প্রথমে আবারও সেই শিপিং ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রাইভেট টিচার রতনস্যার আমার ব্যাংকার মেজআপার কাছে পুনরায় প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন।

মেজআপা আমাকে খবর দিলে পুনরায় ছেলে দেখতে যাই। ছেলে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করে বললো, এবার শিপে গেলে সুবিধা মতো কোনো দেশে নেমে পড়বো। আমি খুশি হয়ে ফিরে এলাম। এক শুক্রবার কথা হলো, আরেক শুক্রবার বিয়ে।

এমনি সময়ে বিয়ের মাত্র পাচ দিন আগে ছেলে আমার মেজআপার বাসায় এসে হাজির। কি কারণ জানতে চাইলে ছেলে অর্থাৎ আমাদের হবু দুলাভাই মফিজ সাহেব বললেন, আপা, আমি তো দীর্ঘ দিন বিদেশে। বিয়ের শপিংয়ে কি কি লাগে জানি না। আপনারা যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে।

আমার মনে হয় এ দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা এবং কন্যার আত্মীয়স্বজনরা এ রকম প্রস্তাবে অবশ্যই খুশি হবেন। অবশেষে আমরাই শপিং করলাম।

সেই সময়ে চলছিল এরশাদ বিরোধী হরতাল। মফিজ সাহেব বিয়ের আগের দিন সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে রিকশায় করে রওনা হলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে চাদপুরের কচুয়া বাবা–মাসহ বরযাত্রার অন্য লোকজনের কাছে।

বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। আয়োজিত পাচশ অতিথির বেশির ভাগই এসে হাজির। সময় মতো বরযাত্রাও এসে গেছে। বর দেখে সবাই প্রশংসা। হিন্দি সিনেমার নাচ গানের মতো আনন্দ উৎসব। বর পক্ষের দেয়া কনের জিনিসপত্র খোলা হচ্ছে। আপার বান্ধবীরাসহ সবাই জিনিস দেখে প্রশংসা করছে।

তার মাঝে হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো, এই, জোড়ার শাড়ি আনেনি?

হ্যা তাই তো! সবাই খোজাখুজি শুরু করলো। পাশেই বসা ছিলেন আমার চাচাতো বোনের অ্যাডভোকেট স্বামী। তিনি হুট করে বলে উঠলেন, আমি আগেই বলেছিলাম কুমিল্লায় বিয়ে না দেয়ার জন্য। এখন দেখো, জোড়ার শাড়িই আনেনি। কারা মাতবরি করেছে এ বিয়েতে তারা কই?

এ কথা শুনে আপাসহ বাড়ির সবাই কান্না শুরু করে দিল। আমার বড় ভাই যিনি মানিকগঞ্জে এক আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ দিতে গিয়ে ছয় দিন পর ফিরেছেন তিনি এসে সব জিনিসপত্র ঢিল ছুড়ে দূরে ফেলে দিচ্ছেন।

মুহূর্তেই চতুর্দিকে কান্নার বেগ এতোই বেড়ে গেল যে, এখনি এই বাড়িতে কেউ মারা গেছে অবস্থা। অ্যাডভোকেট ভগ্নিপতির এই কাণ্ডে আমিও কাদছি। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে চলছে বিয়ে বাড়ির এই আনন্দোৎসবের পরিবর্তে শোকোৎসব। বিয়ে ভেঙে যায় যায় অবস্থা।

ঘণ্টা খানেক পর হবু দুলাভাই মফিজ এবং তার দুলাভাই খলিল সাহেব আমাদের ডেকে বললেন, জিনিস তো সব আপনাদের লোকই কিনেছে। হরতালজনিত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে হয়তো রাস্তার কোথাও জোড়ার শাড়িটি পড়ে গেছে। আপনারা চাইলে এখনই একটা জোড়ার শাড়ি কিনে দিতে পারি।

তাদের এ প্রস্তাবে আমাদের লোকজন কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে বিধায় বিয়ের বাকি কাজ শুরু করার অনুমতি দিলেন। কনেসহ আমাদের ভাইবোনদের কান্না তখনো থামেনি।

আজ তেরো বছর পরও চেয়ে দেখি, বিয়ের পর পরই কিনে দেয়া দুলাভাইয়ের সেই জোড়ার শাড়ি আপা একদিনের জন্যও পরে দেখেননি।

সঙ্গে আপার পুরো এক স্টিলের আলমারি ভর্তি এমনো অনেক শাড়ি আছে যা বাইশ বছর আগে কেনা হলেও একদিনের জন্য পরা হয়নি শুধু রোদ দেয়া আর ভাজ উল্টোনো ছাড়া।
অথচ সামান্য এক জোড়ার শাড়ির জন্য সেদিন বিয়ে ভাঙার উপক্রম হয়েছিল।

সোনারগাও থেকে

ভালোবাসাহীন

হুমায়ূন আহমেদ তার কোনো এক উপন্যাসে লিখেছিলেন, *নারী আর শিশুরা সব সময়ই খুশি হওয়ার জন্য প্রস্তুতই থাকে।* শিশুদের জন্য হয়তো কথাটা সত্য। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে কথাটি পুরোপুরি সত্য কি না বলতে পারবো না। তবে এ কথাটা নিশ্চয় করে বলতে পারি নারী তার পছন্দের পুরুষের কাছ থেকে যে কোনো পুরস্কার পেলে খুব খুশি হয়। বিপরীত অবস্থা যে নারীর মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে তা আমার মা-বাবার সম্পর্ক থেকেই বুঝতে পারি।
আমার মা বাবার সম্পর্ক কোনোদিনও ভালো ছিল এ কথা বলা যাবে না। এর জন্য বাবাকেই দায়ী করা চলে। আম্মা খুবই শাদা-সিধে, নরম, অল্প লেখাপড়া জানা, অল্প শিক্ষিত দেশের হাজার সাধারণ নারীদের একজন। অপরদিকে আব্বা উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু ভীষণ বদমেজাজি বা গোয়ার টাইপের লোক। প্রত্যেক মানুষই একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং প্রত্যেকেরই অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আমার বাবা এই ধ্যান-ধারণায় মোটেই বিশ্বাসী নন। ফলে মা-বাবার দাম্পত্য জীবন ছিল কুৎসিত।
আমার বাবা চাচা মিলে দুই ভাই। বাবার ছোটভাই অর্থাৎ ছোটচাচা একজন উচু মাপের ভ্যাগাবন্ড, কিছুই করেন না। আমার বাবা তার ছোটভাইয়ের প্রতি প্রচণ্ড দায়িত্বশীল। ফলে ছোট চাচার ছয়টা ছেলেমেয়েসহ পুরোটা পরিবার বাবার ওপর চেপে বসে আছে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার বাবা আমাদেরকে নানানভাবে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু বাবাকে এজন্য মোটেই চিন্তিত দেখিনি। বরং কিভাবে তাদেরকে আরো খুশি করা যায় তাই নিয়ে আমার বাবার নানান আক্ষেপ আমাদের বিরক্তির কারণ হয়েছে। আমাদের প্রতি বাবার এই সৎপিতা সুলভ আচরণের ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানীরা ভালো বলতে পারবেন।
বাবা যখন মায়ের জন্য কোনো কিছু আনতেন তখন তার সঙ্গে চাচির জন্য কিছু থাকতো অবধারিত। বিশেষ করে মায়ের জন্য যখন কোনো শাড়ির প্রয়োজন হতো, আব্বা দুটো শাড়ি এনে কঠোর সাম্যবাদীদের মতো সামনে ফেলে দিয়ে আম্মাকে একটা নিতে বলতেন আর অন্যটা চাচিকে দিতে বলতেন। এর পরের বিষয়টা হতো লক্ষ্য করার মতো। আম্মা এ শাড়ি ও শাড়ি দেখেন বার বার। শেষ পর্যন্ত একটা শাড়ি পছন্দ করে বোনদের কাউকে দিয়ে অন্যটা চাচির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। পরক্ষণেই হয়তো বা বোনদের কাউকে বলতেন, না, এ শাড়িটা ভালো না, যা এটা দিয়ে ওটা নিয়ে আয়।

মায়ের আচরণ কোনোদিন বোধগম্য হতো না। এখন বড় হয়ে বুঝি। বাবা কখনো আম্মাকে কোনো জিনিস ভালোবেসে দেননি। প্রয়োজনের সময় একটা শাড়ি কিনতে বললেও তার একটা জায়ের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে এটা কোনোদিনও তিনি ভাবতে পারতেন না।

এখন আমরা অনেক বড় হয়ে গিয়েছি। আম্মাকে ভাইবোনরা কখনো শাড়ি দিলে আম্মা করুণ চোখে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু কোনো আগ্রহ বোধ করেন না।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
কুমারখালী, কুষ্টিয়া থেকে

লোকসান

– ব্যথা

১৯৯৯ সাল। সবেমাত্র এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করেছি। পরীক্ষার পরবর্তী দীর্ঘ দিনের অবসর সময় কিভাবে কাটবে সকলে সেই মহা পরিকল্পনায় ব্যস্ত। দীর্ঘ সময়ে সবাই নতুন কিছু করার চেষ্টা। কেউ কেউ পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোচিং, কেউ কমপিউটার শেখা, কেউ বা স্পোকেন ইংলিশ, কেউ টাইপ শেখার পথ বেছে নিয়েছে। জেমসীয় যুগে সম্মুখের পথকে প্রশস্ত রাখতে সবাই তখন ব্যস্ত। সে যুগে বাস করেও আমার চিন্তা–ভাবনা মান্ধাতা আমলের। এই যুগে এক অভিনব শখ চেপে বসলো। শখ হিসেবে বেছে নিলাম তাত শিল্পে শাড়ি বোনা শেখা। তামাম বিশ্ববাসীই নিজ সজ্জাসঙ্গীকে সোনার প্রতিমা করে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। যদিও বয়সটা বিয়ের অনুপযোগ্য তথাপি আগাম আমার একটাই ভাবনা, যে করেই হোক অর্ধাঙ্গিনীকে নিজ হাতে তৈরি শাড়িই প্রথমে তার অঙ্গে জড়াবো। সোনার পালঙ্কে নয়, আমি সহধর্মিনীকে রাখতে চাই আমার বুকের গোপন নীরবতায়।

শখের কাজে নিমজ্জিত থাকতে থাকতে এক সময় অবসরের মেয়াদ ফুরিয়ে এলো। সময়ের দীর্ঘতার পর বেজে উঠলো অনার্সের ভর্তি ঘণ্টা। সময়ের স্রোতে দিনাজপুর সরকারি কলেজে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হলাম। কিছুদিন পার হলে একই ক্লাসের একটি মেয়ের প্রেমে পড়লাম। মেয়েটির নাম বিশেষ কারণে প্রকাশ করলাম না। তাই তার একটি ছদ্ম নাম কণা দিলাম।

কণা উচ্চতায় পাচ ফুট তিন ইঞ্চি। স্বাস্থ্য জরিপে পাতলার মধ্যে গণ্য, ছোট ছোট গোছানো চুল। শেষ বিকেলের অস্তমিত সূর্যের আলোয় অনিয়ন্ত্রিত চোখে তার ব্রেস্ট দৈহিক গঠনের অনুপাতে অস্বাভাবিকভাবে বড় মনে হলো। গায়ের রূপ ও রঙ মেঘের মতো। তবে শরতে ভেসে বেড়ানো শুভ্র মেঘ নয়, বর্ষার ঘন কালো মেঘের মতো। দৈহিক সৌন্দর্য যাই হোক না কেন, যে কেউ তার চোখ ও দাতগুলো দেখলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে পারবে না। দাতগুলো পদ্মার ইলিশের মতো রূপালী আর চোখ দুটি বদ্ধ পুকুরে ভেসে বেড়ানো সতেজ খলসে মাছের মতো। খলসের পিঠের কাটাগুলো যেন চোখের পল্লবে অবস্থানরত কোমল লোম। সর্বোপরি তার ডান পাশের গালে বিশ্রামরত তিলটি যেন নাটোরের রসগোল্লা। প্রায়ই সময় সে গোলাপি কিংবা নীলাভ সবুজ ড্রেস পরতো। গোলাপি পোশাকে কণাকে বেশ মানাতো। ঠিক যেন দেবী।

ক্লান্ত শরীরে ভর দুপুরে রোদের মাঝে যখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতাম তখন কণা কি জাদুমন্ত্রে আমার সব দুঃখ–কষ্ট ভুলিয়ে দিতো বুঝতেই পারতাম না। সে কখন যে সঙ্গোপনে অপারেশন চালিয়ে আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ করে দিয়েছে টেরই পাইনি। তখন ভয়কে ভয় পাই না। অনাহারে সারাদিন পেরিয়ে গেলেও ক্ষিধে লাগে না। অমাবস্যার রাতে সে যখন হাসে আমি তখন পূর্ণিমার চাদ দেখি। সে যখন কাদে তখন পকেটে রুমাল খুজি। তার সুখগুলো যখন বাতাসের স্পর্শে ভেসে বেড়ায় তখন ফাস্ট ফুডের দোকানে কণার পাশে নিজেকে খুজে পাই।

রোজ ডেটিংয়ে আমার শরীর নিঃসৃত জলধারা গ্রহণ করতে করতে কণা আজ দশ কেজি ওজন বাড়িয়েছে। আমার দেয়া পারফিউমে সে খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। আমি অধম ক্ষীণ শরীর নিয়ে রোদের মধ্যে কণার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে অমাবস্যার কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছি। আর কিছুদিন গেলে আমার সমস্ত সত্ত্বা নিঃশেষ হয়ে যেতো। ভাগ্যিস কণার বাবা–মায়ের সুনজর পড়েছিল আমার ওপর। আমাকে বেপরোয়া উত্তম–মধ্যম দিয়ে আমারই হাতে তৈরি শাড়ি পরিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠালো।

এখনো ভাবতে পারছি না যে, কণা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাকে বিশ্বাস করে শাড়িটা দিয়ে বলেছিলাম, বিয়ের পিড়িতে যেন এ শাড়িটিই দেখি তোমার অঙ্গে। এখন দেখছি অগ্রিম কাজে লোকসান বেশি। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস যতো সহজে নিজ আয়ত্বে আসে সে জিনিস ততো সহজে হারিয়ে যায়। জানি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কতোটা বেগ পেতে হয়েছিল গীতাঞ্জলি লিখতে। তবে এটা ঠিক যে, কণাকে পেতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। বরং সেই প্রথম আমাকে বেছে নিয়েছিল। বিজ্ঞান ভবনের সামনে তেতুল গাছের নিচে দাড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে সে আমাকে বলেছিল সেই আদিমতম কথা *ভালোবাসি।*

মেয়েরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মিথ্যা কথা বলে প্রবচনটি অনেক শুনেছি। কিন্তু কখনো বিশ্বাস করিনি।

কণা তার বিয়েতে আমন্ত্রণ করেছিল। অনুষ্ঠানে আমার ঠোট বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলো না আগের দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা।

প্রায়ই গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখি চারদিকে অন্ধকার। আবারও চোখ বন্ধ করি। ঠিক তখনি ভেসে উঠে নিঝুম সব রাতের স্মৃতি।

দিনাজপুর থেকে

ক্ষমাপ্রার্থী

একজনের সঙ্গে আমার পরকীয়া প্রেম ছিল। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি সেটা আর কারো কাছে পাইনি।

আমি তখন এইচএসসি–র ছাত্র। পড়াশোনার তাগিদে এবং আর্থিক দৈন্যদশার ফলে লজিং নামের অভিশাপের শিকার। আর এ দুইটার জন্য প্রেম–পিরিতি করিনি। তবে এই পরকীয়া সম্পর্কটা ছিল প্রেম–পিরিতির উর্ধে। তার স্বামী–সংসার সবই ছিল। কিন্তু সে কি কারণে যে এতো দুর্গম পথ

অতিক্রম করে আমাকে সময় দিতো সেটা আজো উদঘাটন করতে পারিনি। প্রতি সপ্তাহে চার রাতে আমাদের দেখা হতো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায়। সে তার স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসতো। আমাদের মিলন হতো একটা জনমানব শূন্য চালাঘরে।

ঘটনার রাতে অভ্যাস মতো সে তার শাড়ি খুলে চালাঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর আমরা স্বর্গীয় সুখের সন্ধানে বের হলাম। এভাবে তিন চার ঘণ্টা সময় পার করে তারপর শেষ চুমু দিয়ে বিদায় হতাম। কিন্তু ওই রাতে ঘটলো সবচেয়ে বড় অঘটন। ফলে তাকে আর কোনোদিনও পাইনি। কারণ ওই রাতে সব সুখের মন্থন শেষে যখন সে শাড়ি পরার জন্য গেল তখন দেখে শাড়ি নেই। কি ভয়ানক পরিস্থিতি! আর ওদিকে যাইনি। আমি ওই দিন থেকে আমার সুখের ঠিকানাটা হারালাম। পরে জেনেছিলাম তার স্বামী শাড়িটি নিয়ে গিয়েছিল।

তবে তার কি শাস্তি হয়েছিল সেটা জানতে পারিনি। ঘটনাটা অন্য কোনো লোকের মুখ দিয়ে শুনিনি। তাই বুঝেছিলাম তার স্বামী আর কাউকে বলেনি।

আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তার স্বামীকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। যদিও আজো নাতি–পুতির সঙ্গে গল্প করতে গেলে আমার একান্ত নিজের এই ঘটনাটি আলোড়িত করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন শার্শা থেকে

অকল্পনীয়

– মোহাম্মদ সরওয়ার জাহান

অনেক রকমের আশা নিয়ে মানুষ বড় হয়ে থাকে। কারো সেই সব আশা পূরণ হয় কারো হয় না। আমারও হয়নি। আমার আশা ছিল নিতান্তই ছোট। কিন্তু সে আশাও আমার নিরাশা হয়ে রইলো। যার যেমন ভাগ্য আর কি! ভাগ্য না থাকলে কোনো আশাই পূর্ণ হয় না যা আমি বুঝেছি। বুঝেছি কারো কারো আশা তার অতি আপনজনের কারণেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই করার থাকে না।

আমরা ছিলাম দুই ভাই, এক বোন। দুজনই আমার বড়। একমাত্র বোনটির বিয়ে হয়ে যাওয়াতে মা ভীষণ একা হয়ে পড়লেন। এমনিতে মা ভীষণ অসুস্থ। তার উপর সংসারের সব কিছু দেখাশোনা করা যা মায়ের জন্য অসম্ভব ছিল। তাই বড়ভাই বেকার থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন বাবা। সেটা ২০০০ সালের কথা। ভাইয়া বড় হলেও আমার প্রতি তার কোনো দায়িত্ব বোধ ছিল না। আমার সঙ্গে প্রায় সময়ই তার কথার বনিবনা হতো না। এ জন্য মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিতেন। অবশ্য তার সঙ্গে বেয়াদবি করলেও আমার গায়ে কখনো হাত তোলেননি। বিয়ে ঠিকমতো সম্পন্ন হয়েছিল। সংসারে এলো বাবা মায়ের জন্য বৌমা আর আমার জন্য ভাবী। তাকে নিয়েই আমার এই লেখা।

ভাবী এইচএসসি পাস। তাদের যখন বিয়ে হয় আমি তখন ক্লাস টেনে। সবার ছোট হওয়াতে এমনিতে মা–বাবা, আত্মীয়স্বজনের আদর একটু বেশিই ছিল আমার জন্য।

আমাদের ঘরে এসেই তিনি সবাইকে আপন করে নিলেন। বাবা–মাও প্রায় সব দায়িত্ব তার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একটু বেশি দায়িত্বশীল। ছোট হওয়াতে বোধহয় তা আমার পাওনা ছিল। যখন স্কুল থেকে বিকাল চারটায় ফিরতাম, তাড়াতাড়ি আমার জন্য ভাত রেডি করে বসতেন। কোনো সময় ভাত খাওয়ার সময়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকলে না খোলা পর্যন্ত দরজায় দাড়িয়ে থাকতেন। আমার খোজখবর রাখতেন ঠিক আমার আপুর মতো। সামান্য বেশি শরীর গরম হলে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পানি দিতেন। কখনো হাত কেটে গেলে কখনো এমনি নিজ হাতে ভাত খাইয়ে দিতেন ঠিক আমার স্বপ্নের মতো।

আমার সব সময় আশা ছিল ভাবী হবে শুধু আমার মতো যার কোনো অহঙ্কার থাকবে না। তিনি সবাইকে আপন করে নেবেন। আমাকে ভালোবাসবেন তার আপন ছোটভাইয়ের মতো। আমার সুখে হাসবেন আর দুঃখে কাদবে যার প্রশংসা করবে সবাই। সবার সঙ্গে হাসি–খুশি থাকবেন। সব কিছুই যেন আমার কল্পনার মতো এগোচ্ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, এর মাঝে কোনো ফারাক থাকবে না। কিন্তু আমার সব আশা নিরাশা হয়ে গেল। আমার কল্পনাতে ভাটা পড়লো। লক্ষ্য করলাম, ভাবী আমার সঙ্গে এখন তেমন একটা কথা বলেন না। আস্তে আস্তে তা আরো কমে গেল। দূরে দূরে থাকে। আগের মতো খোজখবর নেন না। ভাত খাওয়ার জন্য ডাকেন না। ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন না। তাদের বাড়িতে যাওয়ার সময় আমাকেও যাওয়ার জন্য বলতেন। এখন বলা তো দূরের কথা, আমার দিকে ফিরেও তাকান না। কিছুই বুঝতেই পারছিলাম না। মাত্র তিন মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে তিনি কেন এ রকম করছেন। ভেবেছিলাম ঠিক হয়ে যাবে।

এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। বিষয়টি পরিবারের সবাই জেনে গেল। সালিশি বৈঠক হলো পারিবারিকভাবে। মিটমাটও হলো। কিন্তু আবার। কথা বন্ধ করে দিলেন। তিনি যে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না তা বুঝতে পেরেছি যখন তার বাচ্চা হলো তখন। তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা দিয়েছিলাম। ফুল নিয়েছেন কিন্তু প্রতিউত্তরে কিছুই বলেননি। প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করলাম। এখনো বুঝতে পারছি না কেন এ রকম করছেন। কোনোদিন তো তার সঙ্গে ঝগড়া করিনি, বেয়াদবিও করিনি। যদি করেই থাকি আমাকে তো বলতে পারতেন। তিনি কিছুই বলেননি। আমিও কথা বন্ধ করে দিলাম। তবে তাকে কখনোই দোষারোপ করিনি। করবোও না। কারণ এতে তার কোনো দোষ ছিল না। আগেই বলেছি, আমার ভাইয়ার সঙ্গে প্রায় সময়ই আমার কথা কাটাকাটি হয়। যার শোধ নিতে তিনি ভাবীর ওপর চাপ তিনি সৃষ্টি করেন যেন আমার সঙ্গে কথা না বলেন। যার জন্য আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি।

কি স্বার্থ থাকতে পারে যার জন্য তারা আমাকে পর করে দিলেন। সারাক্ষণ এসব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতো। পড়ালেখা গেল কমে, বেড়ে গেল আড্ডা। কারণ আড্ডায় থাকলে এই সব চিন্তা মাথার মধ্যে থাকে না। একা হলেই তা মাথার মধ্যে চেপে বসতো। ফলাফলও হলো খারাপ। এসএসসিতে প্রত্যাশা অনুযায়ী পয়েন্ট পেলাম না। ভবিষ্যতে আরো ভালো করার জন্য ঘরের বাইরে বের হলাম। কুমিল্লাতে ভর্তি হলাম। ভেবেছিলাম কয়েকদিন পর পর বাড়িতে গেলে হয়তো কথা বলবেন। সে ভাবাও মিথ্যা হলো। এর মাঝে একটা টিউশনি জোগাড় করলাম। ভাবলাম প্রথম পাওয়া বেতন দিয়ে ভাবীর জন্য কিছু একটা কিনবো। মেয়েদের প্রথম পছন্দ শাড়ি এবং গয়না। গয়না

দেয়া সম্ভব নয়। তাই শাড়িই বেছে নিলাম। জেঠাতো বোনের মাধ্যমে জেনে নিলাম তার পছন্দের রঙ হচ্ছে হালকা গোলাপি। ঠিক সে রকম একটা শাড়ি সেই জেঠাতো বোনের মাধ্যমেই পাঠালাম। সঙ্গে একটি কাগজে লিখে দিলাম জীবনের প্রথম রোজগার করা টাকায় কেনা। আশা ও ভরসা করছি গ্রহণ করবেন।

আমাকে অবাক করে শাড়িটি ফিরিয়ে দিলেন তিনি। আমি কল্পনাও করিনি। শাড়িটি নিয়ে গেলাম তার সামনে। ভাবছি কিছু বলবো। বলিনি। দুজনই চুপচাপ। শাড়িটি তুলে ধরলাম তার সামনে। তারপর আগুন জ্বলছে দেখলাম। পুড়ে গেল আমার প্রথম রোজগারের টাকায় কেনা শাড়িটি। তিনি কিছু বলার আগেই তার রুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

ঠাকুরপাড়া, কুমিল্লা থেকে

ক্ষিধে

আর সবার মতো বাবার আয়েই আমাদের সংসার চলে। আমি ক্লাস সিক্সে পড়া অবস্থায় হঠাৎ বাবার চাকরি চলে যায়। বাবা বাইরের সবার কাছে চাকরি যাওয়ার খবরটা চেপে গেলেন। জানি শুধু আমরা ঘরের লোক। দোকানদারদের সঙ্গে বাবা পাওনা শোধ দিতে কখনোই কৃপণতা করতেন না। উল্টো পকেটে টাকা থাকলে কোনো দোকানদারের অসুবিধা দেখলে তাকে অ্যাডভান্সও দিতেন। পরে দোকান থেকে জিনিসপত্র এনে তা মিটিয়ে নিতেন। তাই এবারে কয়েক মাস দোকানদাররা বিনা বাক্য ব্যয়েই আমাদের সংসারের দরকারি যা আছে বাকিতেই সব দিতে লাগলেন।

একদিন সবাই কিভাবে যেন জেনে গেল বাবার চাকরি নেই। অমনি সবাই সাফ সাফ জানিয়ে দিল আর একটি টাকার সদাই বাকিতে দেয়া যাবে না। তার সঙ্গে তারা সময় বেধে দিল টাকা শোধ দেয়ার জন্য।

এদিকে বাবা চাকরি খুজেই যাচ্ছেন। কিন্তু বাবার ভাগ্য যেন *অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়* তেমন। সংসারে দুর্গতি নেমে এলো। আমরা প্রতিদিন দুই বেলা না খেয়ে থাকি। আর রাতে বাবা যদি কখনো চাল নিয়ে আসেন তবেই আর একবেলা বেশি খাওয়া হয়। এদিকে বাড়িওয়ালা জানিয়ে দিলেন তার বাড়ি ভাড়া যা জমেছে সেটা তিনি মওকুফ করে দেবেন যদি আমরা ঘর ছেড়ে দিই। কিন্তু তা কি সম্ভব! মায়ের খুব আত্মসম্মানে লাগলো। বাবার যে আত্মসম্মান নেই তা নয়। বাবার অবস্থা খুবই নাজুক। তিনি চারদিকে অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখছেন না। এর আগে মা তার গহনা বন্ধক রেখে বাবার হাতে টাকা তুলে দিয়েছিলেন। ঘরে না থাকায় সে গহনার কথা মা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়তেই সে গহনা মা বন্ধকী ঋণদাতার কাছেই স্বল্প দামে বেচে দিলেন।

গহনা বেচে যা পাওয়া গেল তাতে দোকানদারসহ বাড়িওয়ালার টাকা পরিশোধ করা হলো। বাড়িওয়ালা তারপর কোনো উচ্চবাচ্য না করলেও দোকানদারা কেউ বাকিতে আমাদের কোনো জিনিসপত্র দেবেন না জানিয়ে দিলেন। যা টাকা হাতে ছিল, মা খুব হিসাব করে সংসারের খরচ করতে লাগলেন। কিন্তু সে টাকা আর কয়দিন। বাবার চাকরি হচ্ছে না। আমরা চিড়া খাই। সেটাই আমাদের একমাত্র খাওয়া। আমরা ভাইবোনরা মায়ের কাছে ক্ষিধের কষ্টের কথা বলি, মা আমাদের দিকে

আশ্বাসের দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকেন। মা এরপর ট্রাঙ্ক খুলে তার তুলে রাখা শাড়িগুলো সব নামালেন। সেগুলো এর ওর কাছে বেচে দিলেন দ্বিধা না করে। মায়ের সেই শাড়ি বেচার টাকায়ও আমাদের ক্ষিধে নিবৃত্ত করতে হয়েছিল। মায়ের এ কথা শুনে বাবা নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলেছিলেন। এ ঘটনার সপ্তাহ খানেক পরেই বাবা তার পুরনো চাকরি ফিরে পান। আমাদের অভাবও মিটে যায়। কিন্তু অভাবের দিনে আমাদের মায়ের অতি প্রিয় শাড়িগুলো বেচে দেয়ার ঘটনা ভুলতে পারি না।

নাম ঠিকানাবিহীন

ইন্দ্রজাল

– আরজু

দুই চারজন ভালো ছাত্রের মতো আমারও স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবো। সে লক্ষ্যেই এগোচ্ছিলাম। এসএসসি ও এইচএসসি–তে ভালো রেজাল্টও করলাম। ঠিক সেই সময় যখন আমার ক্যারিয়ার গড়ার সময়, আটকা পড়লাম ভালোবাসা নামের ইন্দ্রজালে। আমি হলাম পাগল মজনু। পালালাম তার হাত ধরে অজানার উদ্দেশে। উদ্দেশ্য স্বপ্নের বাসর গড়ার। কিন্তু হায়। বিধি বাম, তার বয়স ছিল আঠারো–র নিচে। কতো উকিল, বড় ভাইয়ের কাছে গেলাম, কতো কাজির পা ধরলাম। ফলাফল শূন্য, ফাকা আস্ফালন মাত্র। অতপর মালপানি যা অনেক কষ্টে গুছিয়েছিলাম অনেকটা *দি লাঞ্চ* গল্পের নবীন লেখকের মতো শেষ হলো। ফাকা পকেটে তো আর বাংলা সিনেমার নায়ক–নায়িকাদের মতো পালিয়ে বেড়ানো যায় না। কি আর করা। বাড়ি ফিরলাম। শুরু হলো গ্রাম্য ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম। বিচারে রায় হলো গার্ডিয়ানদের ইচ্ছা–অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে বিয়ে। গার্ডিয়ানরা যেন এ সুযোগই খুজছিলেন। তারা না দিয়েই রায়কে স্বাগত জানালেন। একবারও আমাদের চাওয়া–পাওয়ার কথা ভাবলেন না। রায় যাই হোক না কেন, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের দায়ে আমাদেরকে দেয়া হলো একশ একটা বেত্রাঘাত। সে মেয়ে হওয়ায় বেচে গেল। কিন্তু আমাকে দেয়া হলো জিগার কাচা ডালের একশ একটা বেত্রাঘাত। বিচার শেষে তাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠানো হলো। আর আমি যেন পড়লাম বিরহ নামের হাবিয়া দোজখে। মুক্তির আশায় গিলে ফেললাম পচিশ মিলিগ্রামের দুই পাতা ঘুমের বড়ি। কিন্তু হায়! সময় মতো নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। ডাক্তার সাহেব হাসি মুখে আমার গলায় নল (নল না বলে রড বলাই যুক্তিযুক্ত) ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে পাকস্থলী ওয়াশ করলেন। বেচে গেলাম সে যাত্রা। ইতিমধ্যে অ্যাডমিশনের সময় এলো। কোচিংয়ের জন্য আমাকে ঢাকা পাঠানো হলো। পৃপারেশন কি নেবো, আগের পড়াগুলোই যেন মস্তিষ্ক থেকে আউট হয়ে গেল। বই নিয়ে পড়ার চেয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেই প্রস্তুতি পর্ব কাটিয়ে দিলাম। ফলাফল মেডিকাল তো দূরের কথা, ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতেও চান্স পেলাম না। কি আর করা! লোকাল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স–এ ভর্তি হলাম। সেখানেও মন টিকলো না। পড়াশোনাই বাদ দিলাম।

মজার ব্যাপার, বন্ধুদের সহযোগিতায় সেই তাকেই আবার বিয়ে করেছি। বাড়িতে বাবা ওঠায়নি। টিউশনি করে কোনো রকম দিন কাটাচ্ছি। তাকে বাসর রাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যেদিন অনেক টাকা

ইনকাম করতে পারবো সেদিনই প্রথম শাড়ি লাল বেনারসি কিনে দেবো। সে প্রতীক্ষায় আছে, এখন আর কোনো শাড়ি পরে না। আমাদের বিয়ের দুই বছর হয়েছে। আমার প্রতিশ্রুতি এখনো পালন করতে পারিনি, ব্যর্থ রয়েছি।

আশার কথা, এ বছর আমি বি.কম পরীক্ষা দিয়েছি। হয়তো রেজাল্টও ভালো হবে। হয়তো লাল বেনারসিও কিনতে পারবো। কিন্তু আমার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল। তাই প্রিয় যাযাদির মাধ্যমে তরুণ সমাজের প্রতি আমার মিনতি, ছাত্র অবস্থায় কারো শাড়ি কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'ভালোবাসার ইন্দ্রজালে' জড়াবেন না।

রেলওয়ে কলোনি, সিরাজগঞ্জ থেকে

বন্ধু

– রোজি সুলতানারা

১৯৯৬ সাল। ডিগ্রি পরীক্ষা দিচ্ছি। পরীক্ষা থাকলেও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ চলতো নিয়মিত। এমনি একদিন আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাসায় গেলাম। বন্ধুটি আমার চেয়ে বয়সে ছিল বড়। তবুও কি করে যেন দুজন দুজনার অসম অথচ ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। সেদিন আমার পরনে ছিল হালকা আকাশি রঙ–এর একটি শাড়ি। এর আগে সে কখনো আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখেনি।

আমি যখন তার বাসার ড্রইং রুমে বসে গল্প করছি, হাত–পা নেড়ে কথা বলছি তখনো সে অবাক চোখে আমাকে দেখছিল।

কথার মাঝে হঠাৎ বললো, আমার সঙ্গে একটু বাইরে যাবে?

কোথায়? প্রশ্ন করলাম,

বললো, একটু মার্কেটে যাবো।

তাকে মজা দেয়ার কথা ভেবে রাজি হলাম। পাশাপাশি রিকশায় যাচ্ছি হঠাৎ বললো, তোমাকে আজ ভীষণ সুন্দর লাগছে।

আমি হাসলাম। বললাম, মার্কেট কেন যাচ্ছো? বললো, তোমাকে সুন্দর দেখে একটা শাড়ি কিনে দেবো।

তার কথা শুনে আমি বিব্রতবোধ করলাম। কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সে আমার ভালো একজন বন্ধু, শুধুই বন্ধু। তাছাড়া এভাবে সে কখনোই আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

আমার গম্ভীর মুখ দেখে সে বললো, তুমি যদি মনে করো আমার কাছ থেকে শাড়ি নেয়াটা উচিত হবে না তাহলে নিও না। তবে আমার খুব ইচ্ছে করছে একটা শাড়ি তোমাকে কিনে দিতে।

এরপর বেইলি রোডে গিয়ে সে আমাকে একটা নয়, দুটো শাড়ি কিনে দিল। ফেরার পথে তেমন কোনো কথা হলো না শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল, পরীক্ষাও শেষ। এর মাঝে ওর সঙ্গে বেশ কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে দেখা হয়নি। একদিন ফোন করে দেখা করতে চাইলো। বললো বাসায় না, আমি মগবাজার আড়ংয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

নির্দিষ্ট সময়ে গেলাম, সেদিনও শাড়ি পরে গিয়েছিলাম। গিয়ে তাকে সেখানে না পেয়ে একা বিরক্ত হচ্ছিলাম। মিনিট পাচ পরে স্কুটারে চড়ে সে এলো। আমাকে দেখে স্কুটারে উঠে আমাকে ইঙ্গিত করলো। স্কুটারে বসে বললো, তোমাকে আজ নৌকাতে চড়াবো।

বুড়িগঙ্গার পাড় ধরে হাটছি আর ওকে বোঝার চেষ্টা করছি। ও যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। এই কিছুক্ষণ আগে ওর আনা চকলেট খাচ্ছিলাম। আমার কাছে ও চকলেট চাইলে একটি চকলেট বের করে দিলাম। কিন্তু সে ওটা না খেয়ে আমার খাওয়া অর্ধেক চকলেট খেয়ে ফেলে একটা দুষ্টু হাসি দিল আমায়। ঘাটে দেখলাম অনেক নৌকা, তার একটাতে চড়ে বসলাম। সূর্যটা কোমল হয়ে উঠেছে। গল্পে মশগুল আমরা। হঠাৎ পাশ দিয়ে ছোট একটি লঞ্চ চলে যাওয়া ঢেউ-এ নৌকাটি প্রচণ্ড দুলতে লাগলো। ও আমার পাশে বসা ছিল। আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার ওপর পড়ে গেলাম। ঢেউ কমে এলে আমি তার বুক থেকে নিজের মাথাটা তোলার চেষ্টা করতেই সে আমাকে বাধা দিল। বললো, থাকো না কিছুক্ষণ এভাবে।

এতোক্ষণ আমি বিভ্রান্ত ছিলাম হঠাৎ করেই যেন আমি পুরোপুরি ওকে জেনে গেলাম। তবুও ফেরার পথে ফাস্ট ফুডের এক দোকানে ধূমায়িত কফির মগ হাতে বললাম, আমাদের সম্পর্কটাকে নিয়ে আমি কনফিউজড।

ও আমার একটি হাত আলতো করে ধরলো বললো, তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

এভাবেই শাড়ি উপহার দেয়া নিয়ে আমাদের ভালোবাসার কথা আমরা বলতে পেরেছিলাম। এরপর কেটে গেল দেড় বছর। অথচ দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব, কলহ, ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমাদের বিয়েটা হচ্ছিল না। দিনের পর দিন আমাদের সম্পর্কটাকে নিয়ে দুই পরিবারের টানা-হেচড়ায় মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এক রাতে আমাদের বাসার ছাদে লুকিয়ে কথা বলছিলাম। রেগে গিয়ে বললাম, ভুলে যাও আমাকে, আমার পক্ষে তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব না।

একথা শোনা মাত্র সে কেদে উঠলো। আমার হাত দুটো ধরে বললো, প্লিজ, এ কথা বলো না, আমরা কালই বিয়ে করবো। কাউকে প্রয়োজন নেই, তুমি এডাল্ট। আমিও প্রতিষ্ঠিত। কোনো সমস্যাই হবে না। প্লিজ তুমি না করো না।

সেদিন তাকে আমি ফেরাতে পারিনি। ঠিক একদিন পর আমরা কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করি। বিয়ের দিন ও আমার জন্য এনেছিল লাল রঙ-এর একটি দামি শাড়ি যা পরে আমাকে সত্যি বৌ-এর মতো লাগছিল। সাজগোজের পর মনে হচ্ছিল বিয়ে বাড়ির নতুন বৌ। এক্ষুণি বিয়ে বাড়ি লোকজনে সমাগম হয়ে উঠবে। কিন্তু তা না হলেও আমরা দুজন খুশি ছিলাম দুজনকে পেয়ে।

এ লেখা লিখছি ২৯ চৈত্র। আর একদিন মাত্র বাকি ১ বৈশাখ-এর। আমার বন্ধু স্বামীটি আমার জন্য বৈশাখের শাড়ি এনেছে। আজো শাড়ি পরলে সে আমাকে আগের মতোই মুগ্ধ চোখে দেখে।

তেজগাও, ঢাকা থেকে

বিদ্বেষ

– জহির পাটওয়ারী

এক সময় নারী দেহে শাড়ি পোশাকটি আমার কাছে উদ্ভট লাগতো। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখতাম মা খালারা চোদ্দ হাত লম্বা শাড়ি পরে চলছেন ফিরছেন। কাজকর্মে নানান রকম বিড়ম্বনায় পড়তেন। কোমরে শাড়ি পেচানো ঝগড়ারত রুদ্র নারী মূর্তি, শাড়ি গলায় বেধে আত্মহত্যার কাহিনী কিংবা শাড়িতে আগুন ধরে কোনো নারীর অকাল মৃত্যু। এসব মিলে এ বস্ত্রটির প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল। সময়ের আবর্তনে আমার এ ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে।

শহরে এসে দেখি মেয়েরা কতো সুন্দর করে শাড়ি পরে। কলেজ ইউনিভার্সিটির মেয়ে হলে তো কথাই নেই। চেহারা যেমনই হোক, শাড়ি পরা প্রতিটি মেয়েকেই আমার কাছে চিত্রপটে আকা ছবির মতো মনে হয়। এতো সুন্দরভাবে শাড়ি পরা এরা কোথেকে শেখে। বিভিন্ন ঈদ পার্বনের ফ্যাশন সংখ্যা সুযোগ পেলেই কিনতাম অথবা ফুটপাথের ম্যাগাজিন দোকানের পাশে দাড়িয়ে নাড়াচাড়া করতাম আর শাড়ি পরা রমণী দেখতাম। এভাবে নিজের অজান্তেই কল্পনায় নারীর ছাপ মনের মধ্যে আকা হয়ে যায়। কোনো গুণ থাকুক বা না থাকুক, সুন্দর করে শাড়ি পরা তাকে জানতেই হবে।

পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করছি দুই বছর হলো। নিকটজনেরা বিভিন্ন জায়গায় পাত্রী খোজা শুরু করে দিলেন। সব কিছু এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। অবশেষে তার খোজ পাওয়া গেল পাশের গ্রামে। যার কথা এর আগে শুধু শুনেছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্রী। দেখতে শুনতেও নাকি বেশ। দুইজনের নাম, গ্রামের নাম, এমনকি পড়াশোনার সাবজেক্টও যথেষ্ট মিল।

আমি সবুজ সঙ্কেত দিলাম। মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা ছিল চূড়ান্ত কথা বলার আগে তারা যেন পাত্রপাত্রীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তারা শুধু মন্ত্র পড়া, চূড়ান্ত তারিখটা বাদে সব কিছু ফয়সালা করে এলেন। আমার কিছুই বলার থাকলো না। আমার মন সর্বদা আনচান করতো তাকে দেখার জন্য, তার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারগুলো জানার জন্য। অবশেষে গত কোরবানির ঈদে মুরুব্বিরা তার সঙ্গে সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করলেন।

ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি আসা কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গেলাম তাদের বাড়ি। আমার লজ্জা কিছুতেই কাটছিল না। বন্ধুরা সাহস যোগালো। শেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎ পর্ব। আমার হার্টবিট বাড়তে লাগলো। পৃথিবীর সব কিছু বোধহয় থেমে যাচ্ছে। আর একটু পরেই আবহমান বাংলার নারী আমার সম্মুখে হাজির হবে। আশপাশের পর্দার আড়ালে অসংখ্য চোখ আমার দিকে তাক করা। মাথা নিচু করে বসে আছি। মনে হলো বহু যুগ ধরে তার অপেক্ষায় বসে আছি।

আমার ধৈর্যের বাধ ভাঙার চূড়ান্ত মুহূর্তে সে এলো। সালাম দিয়ে মুখোমুখি বসলো। আমি কিছুটা অবাক হলাম। শাড়ি পরে নয়, আধুনিক পোশাকে স্বপ্নের রানী আমার সামনে। কিছুক্ষণের আলাপচারিতায়, ডাগর আখির বাণে আমার হৃদয়ের দুকূলে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। আমার বুঝতে বাকি রইলো না নিশ্চিত মৃত্যুর কথা জেনেও পতঙ্গ কেন আগুনে ঝাপ দেয়। মুগ্ধ আবেশে ফিরে এলাম। কিন্তু শাড়ির ব্যাপারটা মাথা থেকে গেল না।

আমাদের বিয়ের আগে প্রেমের প্রায় দুই মাস হতে চললো। পত্র বিনিময় টেলিফোনে আলাপচারিতা চলছে হরদম। ছুটি পেলেই ছুটে যাই তার কাছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই ঢাকার উল্লেখযোগ্য স্থানে। শাড়ির মাহাত্ম নিয়ে লেখা চিঠি দিলেও সে অমনভাবে শাড়ি পরে ঘোমটা দিতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই একবার শাড়ি পরে আমার সঙ্গে বের হয়েছে। *তোমাকে অপূর্ব লাগছে বন্ধু* এ কথা আর বলা হয় না।

সামনে তার মাস্টার্স ফাইনাল। পরীক্ষার পর পরই বিয়ে। ভাবছি যাযাদি আমার লেখা না ছাপলেও *শাড়ি* সংখ্যাটি তার জন্য কেনা বিয়ের শাড়ির সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো। পাঠকদের মজার মজার লেখাগুলো পড়ে তার বিদ্বেষ ভাবটা যদি কেটে যায়। নইলে আমাকেও পূর্ব ধারণায় ফিরে যেতে হবে।

চান্দগাও, চট্টগ্রাম থেকে

নিদর্শন

– রুমা রহমান

এ আমার প্রিয় দুটি শাড়ির গল্প এবং তার সঙ্গে মিশে থাকা আমার ভালোবাসা ও বেদনার গল্প। ১৯৯৬ সাল। আমি সবেমাত্র এইচএসসি পাস করেছি। আমার মেজভাই তখন খুব শখ করে আমায় একটি লালপেড়ে শাদা শাড়ি কিনে দেন। শাড়িটা ছিল খুবই সুন্দর এবং আমার মানাতো চমৎকার। একদিকে জীবনের প্রথম শাড়ি, অন্যদিকে মানুষের প্রশংসা। একজন তরুণীই কেবল জানে সে ভালোলাগা অনুভূতির কথা। শাড়িটা প্রথম পরেছিলাম জাহিদের বোনের বিয়েতে। আমায় দেখে চোখ পাল্টে সে বলেছিল, এ যে রূপকথার শ্বেতপরী!

জাহিদকে আমার খুব ভালো লাগলেও তাকে নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন ছিল না। এদিক থেকে সে ছিল বেশ সাহসী। তার নিত্যসাহচর্যে আমিও এক সময় স্বপ্ন দেখতে শিখি। কিন্তু সে আমার কাজিন এবং ইয়ারমেট হওয়ায় পারিবারিক বাধার বিষয়টি আমার মাঝে মাঝেই ভাবিত করতো। এভাবে দেখতে দেখতে নতুন সহস্রাব্দ আসে, আমাদের সম্পর্কটা ও বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে। সত্যি বলতে কি, আমাদের সম্পর্কটা প্রকৃতপক্ষে বন্ধুত্ব নাকি ভালোবাসার ছিল আমাদের কারোর পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়। আমরা কখনো বা দুজন দুজনাকে ঘিরে স্বপ্নের নিড় গড়েছি, কখনো বা পারিবারিক বাধার কথা ভেবে দুজনার স্বপ্নকে দিয়েছি মাটি চাপা। বজায় রেখেছি স্বাভাবিক বন্ধুত্ব। তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবো ভেবে একবার বেশ কিছুদিন দেখা না করে কাটালাম। মনে হলো বেশ তো আছি। কিন্তু যখনই তার সঙ্গে দেখা, তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি আমি ভালো নেই, ভালো নেই। সেও আমাকে ভুলতে চেয়ে কতোই না পাগলামি করেছে! নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা আর কতোকাল?

অবশেষে তাই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম। দুই চারজন বন্ধু ছাড়া সকলের অগোচরে আমাদের বিয়ে হলো। সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে পেলাম বটে কিন্তু সুখ পেলাম না। পরিবারের কাছে গোপনীয়তা এ সময়ে আমায় তিলে তিলে কষ্ট দিয়েছে। এই দুঃসহ জীবনে তার হাসিমাখা মুখ ছিল আমার একমাত্র আনন্দের উৎস। মেলার সেই দিনটির কথা খুব মনে পড়ে। বিয়ের কিছুদিন পরে রাজশাহী বাণিজ্য

মেলা থেকে সে আমার জন্য একটা লাল শাড়ি কিনেছিল। শাড়িটার আচল ও পাড় ছিল কৃম রঙের এবং সমস্ত শাড়িতে ছিল সূক্ষ্ম হাতের কাজ। শাড়িটা খুব দামি না হলেও বাড়ি থেকে পাঠানো মাস খরচের নির্দিষ্ট টাকা থেকে শাড়িটা কিনতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে জানি। সেদিন তার মুখে আনন্দের যে ছটা দেখেছিলাম... সে যেন মেলার সমস্ত জিনিসই কিনে দেবে আমাকে। কি অসম্ভব মানুষের স্বপ্ন! কি যে ভালোলাগা! সেদিনের পরও তার সঙ্গে বেশ কিছু শাড়ি কিনেছি। তবে সব কিছু ছাপিয়ে সেই ভালোলাগার অনুভূতি আজো আমার স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করে।

আমাদের বিয়ের কথা বছর খানের পর দুই পরিবারেই জানাজানি হয়ে যায়। মাত্র তিন চার মাসের ব্যবধানে কতো কিছুই না ঘটে! শেষ পর্যন্ত স্বামীর ভালোবাসার মূল্যে আমাকে হারাতে হয় ভাই-বোন ও মায়ের ভালোবাসা। তবু বলতেই হয় যে, আমি ভাগ্যবতী। এভাবে বিয়ের পরও স্বামীর সংসারে এসে সকলের ভালোবাসা পেয়েছি। আজ আমি সুখী। কেবল বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কাদে। থেকে থেকেই চোখ আটকে যায় ভাইয়ের ভালোবাসার নিদর্শন জীবনের প্রথম শাড়িটির ওপর। আমার মনে ব্যথা বুঝেই হয়তো একদিন চোর এসে চুরি করে নিয়ে গেল শাড়িখানা। কিন্তু সে বোঝেনি যে, এই বেদনার মাঝেও লুকিয়ে রয়েছে কতো না ভালোবাসা মাখা স্মৃতি!

আমার কষ্টটা আরো বড় হয়ে ওঠে যখন দেখতে পাই যে, আমাদের দাম্পত্য ভালোবাসার প্রথম নিদর্শন স্বামীর দেয়া সেই লাল শাড়িটিও চুরি হয়ে গেছে। আশ্চর্য বিষয় হলো, চুরিটা হয়েছে দিনের বেলায় এবং সেখানে বেশ কয়েকটি শাড়ি থাকলেও বেছে বেছে চোর কেবল ওই দুটি শাড়িই নিয়েছে। তবু সান্ত্বনা, ভালোবাসার নিদর্শন দুটি চোরে নিয়ে গেলেও আমার ভালোবাসা চুরির সাধ্য তার নেই। আমার স্বামীর ভালোবাসা আমায় জড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ। এখন শুধু ভাইয়ের, মায়ের ভালোবাসা ফিরে পাবার অপেক্ষায়...।

ঈশ্বরদী থেকে